কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ

(জীবনী ও গান)

শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ।০ আনা]

IMPERIAL LIBRARY
No ...44... B.Y.
Date...15..5.31

কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ

(জীবনী ও গান)

শ্রীসৌরেশচন্দ্র চৌধুরী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত] [মূল্য ।০ আনা]

LIBRARY
No ...44... B.Y
Date...15.5.31

প্রকাশক

শ্রীহরিগতি দত্ত এম, এস, সি, বি, এল।

বোলপুর (বীরভূম)।

শান্তিনিকেতন প্রেসে

রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

কাঙাল-সেবক উদার-চরিত্র শ্রীযুত হরিগতি দত্ত এম, এস, সি, বি, এল, ও শ্রীযুত রজনীকান্ত হালদার মহাশয়দ্বয়ের আন্তরিক সহায়তায় 'কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ' প্রকাশিত হইল। তাঁহাদের নিকট আমি চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম। এ পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ কাঙালের সেবায় ব্যয় করা হইবে।

১৩৩৬ সাল, উত্তরায়ণ সংক্রান্তি
সীমাইত
বাহিরি পোঃ (বীরভূম)

দীনতম গ্রন্থকার।

ক্ষেপাচাঁদের গান 'অবধূত গীতিকা' কাঙাল ভক্তগণ কর্তৃক ১৩১১ সালে প্রকাশিত হয়। 'জয়দেব শ্মশান' ১৩৩০ সালে প্রকাশিত হয়। 'জয়দেব লীলা'র দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতীয় কথামৃত ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। 'কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ' ১৩৩৬ সালে প্রকাশিত হইল।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী।

"সমস্ত বাধার ভিতর দিয়ে যেখানে মানুষের ধর্ম্ম সমুজ্জ্বল হ'য়ে পূর্ণসুন্দররূপে সবলে নিজেকে প্রকাশ করে, সেখানে বড় আনন্দ। সেখানে আমরা আপনাকে বড় ক'রে পাই। মহাপুরুষের জীবনী এইজন্যেই আমরা প'ড়্তে চাই। তাঁদের চরিত্রে আমাদের নিজের বাধাযুক্ত আচ্ছন্ন প্রকৃতিকেই মুক্ত ও প্রসারিত দেখ্তে পাই।"

जीवनी

কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ

মা বসুন্ধরার কাতর ডাকে যখন পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব পথহারা পথিকগণের পথপ্রদর্শকরূপে আবির্ভূত হ'য়ে জাহ্নবীতীরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে জগন্মাতার নাম-মাহাত্ম্য প্রচার ক'র্‌ছিলেন ও ভগবৎ-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় পিপাসুজনগণের প্রাণের পিপাসা মিটাচ্ছিলেন এবং যখন বীরসাধক বামাক্ষেপা বীরভূম দ্বারকানদীর তীরে তারাপীঠের শ্মশানে আশ্রয় নিয়ে কত শত মোহান্ধকে দিব্যদৃষ্টি দান ক'র্‌ছিলেন, সেই সময় অন্য এক আত্মত্যাগী মহাপুরুষ বীরভূম অজয়-নদের তীরে জয়দেব শ্মশানে এসে দরিদ্র নারায়ণের সেবায় দেহপাত ক'র্‌ছিলেন; তিনি অবধূত কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ। বহু চেষ্টাতেও তাঁর পূর্ব্ব পরিচয় কিছু সংগ্রহ ক'র্‌তে পারি নাই। তাঁর কতিপয় ভক্ত-শিষ্যের নিকট এইটুকু পরিচয়মাত্র পাওয়া যায় যে, তাঁর জন্মস্থান মেদিনীপুর জেলায় খনিনগড় গ্রাম; ৺কামদেব মুখোপাধ্যায়ের সন্তান। জনসমাজে এবং স্বরচিত গানের ভণিতায় তিনি যে নাম প্রচার ক'রে গিয়েচেন, আমরা তাঁকে সেই মধুর কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ নামেই ডাক্‌তে চাই। একে কাঙাল, তার উপর ক্ষেপা; নিজ নামের এই দীনতা, অসার সঙ্গ ও ব্যর্থ কোলাহল থেকে দূরে দূরে রেখে তাঁকে শ্রীভগবানের নাম প্রচারে যথেষ্ট সুযোগ দান ক'র্‌বে, দরিদ্রনারায়ণের সেবার শুভ-শক্তি অক্ষুন্ন রাখ্‌বে, বোধ হয় এই ধারণাতেই তাঁর ঐ নাম ধারণ।

কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ

কাঙালের কাতর কাহিনী শোন্‌বার জন্যে প্রাণের টানে কজন তার পাশে ছুটে যায় বা সহানুভূতির বশে তাকে কোলের কাছে আনে? দারুণ অত্যাচারে কাঙালের হৃদয়ে নিষ্ঠুর আঘাত কর্‌বার সময় কজন বোঝে হয়ত নিপীড়িত সেই কাঙালেরই পবিত্র হৃদয়-মন্দিরে শ্রীভগবান দিনরাত জাগ্‌চেন? কজন হিসাব করে কোন্ ক্ষেপার ক্ষেপামির মূলে কী গভীর বেদনা? কতখানি অন্তর্নিহিত সত্য? কোন্ ভাবের অদম্য আবেশে বহিরঙ্গে তাঁর ক্ষেপার সাজ? অন্তর তাঁর ক্ষেপার খেয়ালে ভরা? শিব, শুক, সনাতন শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ হ'তে শ্রীরাম-কৃষ্ণ, তৈলঙ্গস্বামী, বিষেপাগলা, বামাক্ষেপা, কাঙালক্ষেপা প্রভৃতি পর্য্যন্ত কত ভাবের কত ক্ষেপা জীবন-সংগ্রামে আজন্ম কিরূপ ক্ষেপামি-বৃত্তি গ্রহণ ক'রে গিয়েচেন তা অনেকেরই অবিদিত নাই। ক্ষেপা নাম শুন্‌লেই যে দংশন-ভয়ে তাঁর কাছ থেকে দশ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে এমন কথা নয়! আধিব্যাধি-দংশন-ভয় নিবারণের অমোঘ উপায় দুর্লভ-ভাবরসমগ্ন আত্মভোলা ক্ষেপারাই নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন; সাধন-সমুদ্র মন্থন ক'রে অমৃত তুলে সেই অমৃত পান করিয়ে তাঁরাই অমরত্ব দান করেন মর-জগৎকে। তাঁদের চোখে ধর্ম্মগত কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি থাকা সম্ভব নয়, কেননা সকল ধর্ম্মেরই চরম লক্ষ্য এক।

"রুচিনাং বৈচিত্র্যা দৃজু কুটিল নানা পথ জুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

নদীসমুদয় নানাপথগামী হ'লেও পরিণামে যেমন একসমুদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপ মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও উপাসনার পথ পৃথক হ'লেও পরিণামে ব্রহ্ম প্রাপ্তি সকলেরই শেষ উদ্দেশ্য হয়। শ্রীভগবান গীতায় ব'লেচেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" —গীতা চতুর্থ অধ্যায়।

অর্থাৎ

সেই ভাবে আমি তুষ্ট তাহারে, যেই ভাবে মোরে যেজন ভজে।
আমারই কর্ম্ম সাধে সবজন যেরূপ কর্ম্মে যেজন মজে॥

কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ ছিলেন এক অভাবনীয় ভাবের ক্ষেপা। বাল্যকাল হ'তেই সরলতা, বিশ্বাস, ভক্তি, ত্যাগ, বৈরাগ্য তাঁর অন্তরে দৃঢ়মূল হ'য়ে ব'সেছিল। কোন পার্থিব ভোগেই তাঁর লিপ্সা ছিল না। গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক সংস্কৃত টোলে কিছুদিন অধ্যয়ন ক'রেছিলেন। কিন্তু পরমার্থ চিন্তা অধিকদিন তাঁকে অর্থকরী বিদ্যাচর্চ্চায় রত থাকতে দেয় নাই। যে বিদ্যা লাভ ক'রলে অন্য কোন বিদ্যা অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না—যে বিদ্যা অপর সকল বিদ্যা অপেক্ষা গরীয়সী—অবিদ্যানাশিনী দুর্জ্জ্ঞেয় সেই তত্ত্ববিদ্যাই তাঁর লক্ষ্য হয়। শাস্ত্র বলেন, "সা বিদ্যাতন্মতির্যয়া" —যাহা দ্বারা শ্রীহরিতে মতি হয় তাহাই বিদ্যা।

বাল্যকাল হ'তেই তিনি সামান্য কোন হিংস্রক কাজেই গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব ক'রতেন এবং তাঁর হৃদয় পরদুঃখে অতিমাত্রায় কাতর হ'য়ে পড়ত। যৌবন সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য তাঁর সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পুত্রের উদাসীন মনকে গৃহবন্ধনে বদ্ধ ক'রবার আশায় তাঁর পিতামাতা বিবাহের প্রস্তাব করেন; তখন তাঁর বয়স আঠার বৎসর। সে প্রস্তাবে তিনি কোনমতেই সম্মতি দেন নাই। নিরূপ-রূপ-মাধুর্য্যে নয়ন সার্থক ক'রবার জন্যে ভক্তের নির্ম্মুক্ত অন্তরে যখন সত্যশুদ্ধ বেদনা জেগে ওঠে তখন নারীদেহের নশ্বর রূপের মোহ তাঁকে স্পর্শ পর্য্যন্ত ক'রতে পারে না। সাধনার সেই উচ্চতম অবস্থায় বীরসাধক-কণ্ঠে উচ্চারিত হয়,—

"কোটী পরশমণি থাকয়ে সম্মুখে,

তিলোত্তমা রমা রম্ভা মন যদি ছলে,
কৃষ্ণের ইচ্ছায় মম মন নাহি টলে।"

কাঙাল ক্ষেপাচাঁদের পিতামাতা বিবাহের জন্তে তাঁকে বিশেষরূপ অনুরোধ করায় একদিন তিনি এই ব'লে গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ ক'রে চ'লে যান যে "কৃপাময়ীর কৃপা হ'লে কে যায় মায়া পারদ ?"—একথা তাঁর রচিত গানের মধ্যেও একস্থানে আছে। তারপর পশ্চিম প্রদেশে গিয়ে যোগাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক চব্বিশ বৎসরকাল পার্ব্বত্য প্রদেশে অতি-বাহিত করেন ও নানা তীর্থ ভ্রমণের পর অবশেষে পরমতীর্থ শ্রীবৃন্দাবন-ধামে উপস্থিত হন। শ্রীবৃন্দাবন রাধাকুণ্ডে তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তিনি আপন প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় জন্ত জয়দেব ক্ষেত্রে গিয়ে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ান্তে সেখানে সমাধিস্থ হবেন ; এ বিষয় তাঁর নিকট জানা গিয়েছিল। এ দেশের বৃদ্ধগণের নিকট শুন্‌তে পাওয়া যায় যে কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ সন ১২৮০ সালে জয়দেব কেন্দুলিগ্রামে আসেন ; সে আজ প্রায় ৫৭ বৎসরের কথা। তিনি প্রথম যখন আসেন, তখন তাঁর দেহ মাথার জটায় ঢাকা, গলায় একটী নর-অস্থির কপালী থুলী ও একগাছি ছোট ঝাঁটা ঝোলান, কোমরে শিকল দিয়ে কাঠের কৌপীন আঁটা, এবং হাতে একটী মাটীর করোয়া পাত্র ও একখানা ছেঁড়া কম্বল তাঁর সম্বল ছিল। তাঁর গানের মধ্যেও এক স্থানে আছে :—

"অনুরাগে মন ম'জেছে যার।
সহজে সুরাগের মানুষ নির্ব্বিকার,
তার জনসমাজে লাজের কথা হ'য়েছেরে অলঙ্কার ॥
জ্যান্তে মরা হয় অনুরাগী, ওরে জাতের বিচার আচমন আচার
বেদ বিধিত্যাগী (ক্ষেপা সে)
ভব পথের সম্বল ছেঁড়া কম্বল, আর নিয়েছে হাতে ভাঁড় ॥"

নর কপাল সম্বন্ধে 'কথা সরিৎসাগরে' আছে, এক সময় পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "নর কপাল এবং শ্মশানে তোমার এমন প্রীতি কেন?" মহাদেব উত্তর করেন, "কল্প অবসানে যখন জগৎ জলময় ছিল, তখন আমি উরু ভেদ ক'রে একবিন্দু রক্তপাত করি। সেই রক্ত হ'তে অণ্ড জন্মে, সেই অণ্ডে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তারপর আমি বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশে প্রকৃতিকে সৃজন করি। সেই প্রকৃতিপুরুষ হ'তে অন্যান্য প্রজাপতি এবং সেই প্রজাপতিগণ হ'তে অখিল প্রজার সৃষ্টি হয়। তখন আমিই চরাচরের সৃষ্টিকর্ত্তা ব'লে ব্রহ্মার মনে দর্প হ'য়েছিল। সেই দর্প সহ্য ক'রতে না পেরে আমি ব্রহ্মার মুণ্ডচ্ছেদ করি। সেই অবধি আমার এই মহাব্রত, সেই অবধিই আমি কপাল-পাণি ও শ্মশানপ্রিয়।"

কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ প্রথমতঃ এখানে এসে ৺জয়দেব শ্মশানের বট গাছের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে সময় তিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হ'তে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত বটগাছের ডালে পা লাগিয়ে মাথা নীচের দিকে দিয়ে ঝুল্‌তেন। বেলা তৃতীয় প্রহরের পর গাছ থেকে নাম্‌তেন ও কিছুক্ষণ পরে স্নান ক'রে ৺জয়দেব শ্মশানের পার্শ্ববর্ত্তী টিকর্‌বেতা, বেরুলিয়া প্রভৃতি গ্রামের গ্রাম্য পথে পথে "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ" এই নাম কীর্ত্তন ক'রে চাল ডাল যা কিছু ভিক্ষা মিল্‌ত তা হ'তে প্রয়োজন মত নিয়ে গ্রামের বাইরের ছুঁতো হাঁড়ি কুড়িয়ে এক পাকে সমস্ত রেঁধে ঐ একবারমাত্রই আহার ক'রতেন। ভিক্ষা কিছু বেশি হ'লে তা দরিদ্রনারায়ণের সেবায় দান ক'রে দিতেন।

নাম কীর্ত্তন ক'র্‌বার সময় মধ্যে মধ্যে তিনি তন্ময় হ'য়ে নৃত্য ক'র্‌তেন। পদ্মপুরাণ বলেন,—

"পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশো দৃগভ্যাং
দোর্ভ্যাঞ্চা মঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসার্য্যতে রাজন
কৃষ্ণ ভক্তস্য নৃত্যতঃ॥"

হে রাজন! কৃষ্ণভক্ত যৎকালে ভক্তিসহকারে নৃত্য ক'রতে থাকেন, তখন নানারূপে জগতের অমঙ্গল বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তাঁর পদদ্বয় পৃথিবীর, নয়নযুগল দিক্‌সমূহের, এবং বাহুদ্বয় অমরপুরের অমঙ্গল বিদূরিত করে। শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত বলেন,—

"যাঁর নাম স্মরণে সমস্ত বন্ধক্ষয়।
যাঁর নাম স্মরণেও সর্ব্বত্র বিজয়॥
সকল ভুবনে দেখ যাঁর যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভু পায়॥"

"উচ্চৈঃ শতগুণস্তবেৎ"—উচ্চৈঃস্বরে নাম নিলে শতগুণ পুণ্য উপার্জ্জিত হয়। শ্রীগোপী গীতা বলেন,—

"তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবিগৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণকথা সন্তপ্ত জীবনে সুধাবর্ষণ করে। তত্ত্বদর্শী কবিগণ উহাকে পাপনাশকারী বলিয়া বর্ণনা করেন। উহা শ্রবণ মঙ্গলময় ও শান্তি-দায়ক। এই পৃথিবীতে যাঁরা বিস্তারিতভাবে কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন তাঁরাই ভূরিদা অর্থাৎ ভূরি পরিমাণে অমৃতদাতা।

একটা না একটা কাজ তাঁর লেগেই ছিল এবং যে কাজই ক'রতেন,

যথাশক্তি দুঃস্থের দুঃখদুর্গতিমোচন তাঁর জীবনের মহাব্রত ছিল। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর তিরোভাব সময়ে জয়দেব-কেন্দুলি গ্রামে মহামেলা হয় ; বহু দেশীয় বহু যাত্রী এই মেলায় আসেন। তিন চা'র দিন ধ'রে ঐ স্থানে বিপুল জনতা হ'য়ে থাকে। এই মেলার সময় কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ বটগাছের তলায় সেই ছেঁড়া কম্বলখানি বিছিয়ে ব'সে থাক্‌তেন। যাত্রীগণ তাঁর নিকটে গিয়ে কেউ পয়সা, কেউ এক মুঠো চাল, কেউ ফলমূল, কেউ বা মিষ্টান্নাদি দিতে দিতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত তা স্তূপ হ'ত। বেলা তৃতীয় প্রহরের পর স্নানের সময় তিনি ঐ সমস্ত যাত্রিদানের সামগ্রী নদীগর্ভে সমবেত কাঙালীগণকে দান ক'রে দিতেন। কয়েক বৎসর পর তা পূর্ব্বভাবে বিতরণ না ক'রে কতিপয় ভদ্রসন্তানের উদ্যোগে কাঙালী ভোজনের ব্যবস্থা করেন ; সম্প্রতি তা মহামহোৎসবে পরিণত। এই মহোৎসবে চার দিন ধ'রে অসংখ্য যাত্রী পরম তৃপ্তির সহিত ভোজন ক'রে থাকেন। বেলা দুপুর হতে রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত দীয়তাং ভুজ্যতাং রবের আর বিরাম থাকে না। নিজনাম কাঙাল প্রচার ক'রে জয়দেব তীর্থে তিনি কাঙালের মা বাপ হ'য়ে ব'সেছিলেন। তাদের ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল, বস্ত্রহীনতায় বস্ত্র, শোকে সান্ত্বনা দিয়ে সৎপথে শান্তির পথে চালিত ক'র্‌তেন। দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত বহু ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে কেউ তাঁর পবিত্র স্পর্শগুণে, কেউ কেউ বা মাত্র তাঁর মুখের কথায় চিরারোগ্য লাভ ক'র্‌তেন। নামের প্রত্যাশা না থাকায় তিনি দেশের অধিকাংশ লোকের নিকট অজ্ঞাত ছিলেন। অতি অল্প সময়ের জন্যও যদি কোন দিন কারও ভাগ্যে তাঁর সঙ্গসুখ লাভের সুযোগ ঘ'টত, তার পর হ'তে সময় অসময়ে, অবসর অনবসরে, তার মন কে জানে কিসের টানে সেই

অন্তরে বিরুদ্ধভাব নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েও কেউ পূর্ব্বভাব নিয়ে ফির্‌তে পারত না। অজ্ঞাতসারে অটুট ভক্তিসূত্রে কেমন যেন আবদ্ধ হ'য়ে প'ড়ত, তাঁর কাছ থেকে উঠে আস্‌বার শক্তি পর্য্যন্ত যেন হারিয়ে ব'স্‌ত। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, কথা তিনি অতি অল্পই কইতেন। কথার ছটায় লোক ঠকাবার ভাণ তাঁর মোটেই ছিল না। তিনি ব'ল্‌তেন, "বেশি বাজে বকুনিতে বেজায় আয়ুক্ষয় হয়।" পূর্ব্বেই বলা হ'য়েচে একটা না একটা কাজ তাঁর লেগেই থাক্‌ত। কাজ ছাড়া কোন রকমেই সময় কাটাতে পার্‌তেন না। কোন কাজ না থাক্‌লে রাস্তায় মাটি দিয়ে তা প্রশস্ত ক'র্‌তেন। বিগত ১৩১০ সালে বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলায় ফসল ভালোরূপ উৎপন্ন না হওয়ায় প্রয়োজনমত মহোৎসবের চাল, ডাল সংগ্রহ হবে না ভেবে ভিক্ষার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে যান। সেখানে লোনা লাগায় হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েন; কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে মহোৎসবের সম্পূর্ণ যোগাড় নিয়ে ফিরে আসেন ও পূর্ণ উদ্যমে মহোৎসব সাঙ্গ করেন। মহোৎসব শেষ হ'লে সমবেত ভক্তগণের নিকট মনোভাব প্রকাশ করেন যে "আমার এ ক্ষেপের কাজ শেষ হ'য়েচে, সত্বর দেহত্যাগ ক'র্‌ব।" তারপর মাত্র কয়েকদিন তিনি দেহধারণ ক'রেছিলেন। ১৪ মাঘ একাদশীর দিন প্রায়োপবেশন ব্রত নিয়ে 'পঞ্চদশমুণ্ডী' সিদ্ধাসনে ব'সে সমাধিস্থ হন, এবং ১৭ মাঘ মাঘী পূর্ণিমায় রাত্রি দুইটার সময় নারায়ণের নাম স্মরণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে সজ্ঞানে দেহ-ত্যাগ করেন। তাঁর দেহত্যাগের পর বৎসর ভক্ত উত্তমদাস দত্ত এবং শিষ্য রজনীকান্ত হালদার মহাশয়দ্বয় সাধ্যমত মহোৎসবের যোগাড় ক'রে জয়দেব কাঙাল কুটিরে উপস্থিত হন। সিদ্ধপুরুষের যোগবল-অনুষ্ঠিত বিরাট মহোৎসব অতি ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে কেমন ক'রে সম্পন্ন ক'র্‌ব, এই দুর্ভাবনায় তাঁদের সারারাত কেটে যায়। ভোর বেলায় তাঁরা

এক অত্যাশ্চর্য্য আশ্বাস প্রাপ্ত হন। ঘটনাটি এইরূপ—রোগমুক্তির আশায় কোনও একজন পূর্ব্বদিন ক্ষেপাচাঁদের সিঙ্কাসন তলায় ধন্না দিয়েছিল। ভোর বেলায় রোগযন্ত্রণার উপশম বোধ ক'রে শৌচার্থে নদীতে যায়। সে এক জোড়া খড়ম সহ ফিরে এসে সংবাদ দেয় যে নদীকূলে ক্ষেপাবাবার সঙ্গে তার দেখা হ'য়েচে, তিনি তাকে খড়ম জোড়া দিয়ে ব'ল্লেন, "আমি যাচ্ছি, তুই খড়ম নিয়ে চল্, গিয়ে সে বেটাদের কর্ত্তা সাজ্‌তে বারণ কর্; মহোৎসব যেমন হয় তেম্নি হ'য়ে যাবে।" নদীর ধারে বহু ভক্ত গিয়ে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান ক'রেও খড়ম প্রেরকের কোন উদ্দেশ না পেয়ে সেই খড়মের পূজো আরম্ভ ক'র্লেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে অল্প আয়োজনেই সেই বিরাট মহোৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিপুল ভাবেই সুসম্পন্ন হয় এবং আজ পর্য্যন্ত হ'য়ে আস্‌চে। ক্ষেপাচাঁদের মাহাত্ম্যে দীন দুঃখী কেহই মেলায় অভুক্ত থাকে না, বা এমন বিরাট ব্যাপারে কখনও কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে না। তাঁর সমাধি মন্দিরে বার মাসই বহুভাবের লোক সমাগম হ'য়ে থাকে। মেলার ক'দিন মন্দিরের চতুঃসীমা পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য হ'য়ে থাকে, যাকে বলে তিল ধারণের স্থান না থাকা। এখানে সমাধি ও সমাধিস্থ যোগীর লক্ষণ সম্বন্ধে এক কথা ব'লে রাখি :—

"সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্ম পরমাত্মনোঃ।
নিস্তরঙ্গ পদ প্রাপ্তিঃ পরমানন্দরূপিণী ॥
নিশ্বাসোচ্ছ্বাস মুক্তো বা নিস্পন্দোঽচল লোচনঃ।
শিবধ্যায়ী সুলীনশ্চ স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥
ন শৃণোতি যদা কিঞ্চিৎ ন পশ্যতি ন জিঘ্রতি।
ন চ স্পর্শং বিজানাতি স সমাধিস্থ উচ্যতে ॥"—যোগতত্ত্ব বারিধি।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য হওয়া আর সমাধি হওয়া সমান।

নিগুবন্ধ পদলাভ ও পরমানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াই সমাধি। শ্বাসপ্রশ্বাস-বর্জ্জিত, স্পন্দরহিত, নির্নিমেষ চক্ষু, শিবধ্যানে লীনচিত্ত, এইরূপ ব্যক্তিই যথার্থতঃ সমাধিস্থ ; এবং যিনি কিছুমাত্র দেখেন না, শুনেন না, গন্ধ আঘ্রাণ করেন না, স্পর্শকেও জানেন না, তিনিও সমাধিস্থ।

তান্ত্রিক সাধক কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ অবধূত ছিলেন। অবধূত আশ্রম মুক্তির অবস্থা—সাধনার শেষ সীমা। এ সময় তাঁহারা যে কি অবস্থায় থাকেন তা সাধারণ জ্ঞানগম্য নয়। তাই সাধারণ লোকচক্ষে তাঁরা পাগল ব'লে পরিচিত হ'য়ে থাকেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁর বিবেক-চূড়ামণিগ্রন্থে অবধূত লক্ষণ দিয়েচেন :—

"দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্ বাপি চ বালবদ্ বা পিশাচবদ্ বাপি চরত্যবন্যাম॥"

কখন দিগম্বর হ'য়ে, কখন বা বসন পরিধান ক'রে, কখন বল্কল বা চর্ম্মাম্বর ধারণ ক'রে, কখন বা জ্ঞানাম্বর গ্রহণ ক'রে, কখন বা উন্মত্তবৎ, কখনও বা বালকের ন্যায়, কখন পিশাচের ন্যায় ধরা ভ্রমণ করেন। সাধক বামাক্ষেপা বলেচেন, "অবধূতের অবস্থা—ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা—সাধারণ চক্ষে মৃতের অবস্থা, তখন তাঁহার কিছুই বিচার থাকে না। তখন তাহাতে তাঁহাতে মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা আশ্রমে প্রবেশ করেন না, লোকালয়ে কখন আসেন না, তাঁহারা আসব অর্থাৎ সিদ্ধ মদ্যপানে সর্ব্বদাই মত্ততাবস্থায় অবস্থান করেন। তখন আর তাঁহাদের আমিত্ব থাকে না, তত্ত্বমসি লাভ হ'য়ে গেছে।"—

অবধূতগণ শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত। তন্ত্রে ৪ প্রকার অবধূতের উল্লেখ দেখা যায় ; (১) ব্রহ্মাবধূত (২) শৈবাবধূত (৩) ভক্তাবধূত (৪) হংসাবধূত। কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ শৈবাবধূত ছিলেন, কিন্তু বিভিন্নপন্থী

উপাসকগণের বিভিন্ন উপাস্য দেবদেবীগণের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল,—

তাঁর রচিত নীচের দুখানি গান থেকেই তা সম্যক বোঝা যাবে :—

(১)

হে ত্বং জগদীশ দীনেশ গণেশ কালী বনমালী হর।
সৃজন পালন নিধন কারণ, ত্রিগুণ ধারণ কর ॥
নিত্য নিরুপাধি, আদি অন্তহীন,
অনাদির আদি, অভেদ স্বাধীন,
আছয়ে ত্রিলোক তুঁহার অধীন, দীননাথ গুণাকর ॥১॥
অবনী আকাশ পবন জীবন, হও হুতাশন প্রকৃতি প্রধান,
সগুণ নির্গুণ শমন দমন, সকল ভুবন চর।
সাকার নাকার তাপানল বার, বারণ-মরণ-জর ॥২॥
সাকারে তোমারে যে করে সাধনা,
সাকারে তাহারে বিতর করুণা,
নিরাকার উপাসকে নিদয়তা হও ত ভাবনা পর।
যে যে ভাবে ভাবে তাতে তার হইবে ভব অর্ণবতর ॥৩॥
রিপুগঞ্জন জনরঞ্জন, ভব ভঞ্জনাভাব বঞ্চন,
নিরঞ্জন জীবেরই জীবন, জ্যোতির্ময় অধর।
দীন কাঙাল ক্ষেপাচাঁদে এ ভব কয়েদে কর কর অবসর ॥৪॥

(২)

খোদা নাম জাদা দাদা যে কারণে শোন বলি তা সযতনে।
খোদকারি ভোর দুনিয়া আর দুনিয়ার যা কিছু সব বর্ত্তমানে ॥
অনুমান সাত দুনিয়া, স্বর্গ হিন্দুর, ভেস্তা বলে জয় কোরাণে।

শরীরে তার সকলি হয় নকলি পয়দা পালন পতনে।
আপ অতস থাক বা বসত, আসমানেতে আছে সমানে ॥২॥
আলেখচাঁদ মালিক বটে, তত্ব ঘটে চেতরূপে সদা রমণে।
মহিমার নাইক সীমা কার গরিমা এক তারিখে নয় কেমনে ॥৩॥
যা হ'তে এলি হেথা কর্ম্মি যা তা, কের্দ্দানি কার, কর্ম্মে জেনে।
কদম তার ভাবরে মুদম, নিত্য আদম্, কাঙাল ক্ষেপাচাঁদে ভণে ॥৪॥

কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ ব'ল্‌তেন, "পথ নিয়ে পরস্পর ঝগড়াঝাটি ক'রে চলাপথে বে-আইন ভিড় করার বিপদ কত? যে পথে যে পারে মূলে পৌছান হ'চ্ছে মূল কথা।" এ শুধু তাঁর কথা নয়—প্রকৃত সাধক মাত্রেরই মুখে ঘোরফেরে এই একই কথা ফুটে ওঠে,—

"ভিন্ন ভিন্ন মত ভিন্ন ভিন্ন পথ কিন্তু এক গম্যস্থান।
যে যেমনে পারে ট্রেণে ইষ্টিমারে হোক্ সেথা আগুয়ান ॥"

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব কখন বা কোন ভক্তের কালী ও কৃষ্ণে বিশেষ ভেদবুদ্ধি দেখে ব'ল্‌তেন, "ওকি হীনবুদ্ধি তোর? জান্‌বি যে তোর ইষ্টই কালী, কৃষ্ণ, গৌর, সব হ'য়েচেন। তা ব'লে কি নিজের ইষ্ট ছেড়ে তোকে গৌর ভজ্‌তে ব'ল্‌ছি তা নয়। তবে দ্বেষ-বুদ্ধিটা ত্যাগ ক'র্‌বি।"

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও ব'ল্‌তেন, তোর ইষ্টই কৃষ্ণ হ'য়েচেন, গৌর হ'য়েচেন—এই জ্ঞানটা ভিতরে ঠিক রাখ্‌বি। দেখ্‌না, গেরস্তের বউ, শ্বশুর বাড়ি গিয়ে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, দ্যাওর, ভাসুর সকলকে যথাযোগ্য মান্য ভক্তি ও সেবা করে; কিন্তু মনের সকল কথা খুলে বলা, আর শোয়া কেবল এক স্বামীর সঙ্গেই করে। সে জানে যে, স্বামীর জন্যেই শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি তার আপনার। সেই রকম নিজের

অন্ত সকল রূপের সহিত সম্বন্ধ, তাঁদের সব শ্রদ্ধা ভক্তি করা এইটে জান্‌বি। ঐরূপ জেনে, দ্বেষ বুদ্ধিটা তাড়িয়ে দিবি।”—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ (গুরুভাব)।

পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন, “ঠাকুর সচ্চিদানন্দ-রূপের খেই কোথায়?” মহাদেব ব'ল্‌লেন, “বিশ্বাস।” মন্তে কিছু আসে যায় না। যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষিত হন্ না কেন, বিশ্বাসের সহিত তিনি তারই সাধন করুন।”—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ। ভক্তমাল গ্রন্থে দেখা যায়—পরীক্ষিৎ শ্রীহরির নাম শ্রবণে, ব্যাসাত্মজ শুকদেব তাঁহার নাম কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তদীয় স্মরণে, লক্ষ্মী তাঁহার পাদ-সেবনে, পৃথু তদীয় পূজনে, অক্রুর তাঁহার অভিবন্দনে, কপিরাজ হনুমান তাঁহার দাসত্বে, অর্জ্জুন তাঁহার সখ্যতায় এবং বলি নৃপতি সর্ব্বস্বদানে ও আত্মনিবেদনে সেই পরম মঙ্গলময় শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও ভক্তির নব অঙ্গের উল্লেখ দেখা যায় :—

“শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥”

শ্রীভগবদ্বাক্য :—

“ভকত বিশেষে যেই যেই বিধ মূরতি পূজায় নিরত রয়,
আমার কৃপায় সেই দেবতায় অচলা ভক্তি প্রাপ্ত হয়।”

—পাঞ্চজন্য।

কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ সব সময়েই এই কথাই ব'ল্‌তেন। ইহা তাঁর গানের মধ্যেও এক স্থানে আছে, “যে যে ভাবে ভাবে তাতে তার হইবে ভবঅর্ণবতর।”

সংসারে বহু প্রকারই সাধক আছেন; এক এক শ্রেণী এক এক সাধনায় রত। তাহার মধ্যে দুই শ্রেণীর সাধক প্রধান :—

(১) যাঁরা বিবেক বৈরাগ্য শস্ত্রধারে মায়াপাশ ছেদন ক'রে আত্মমুক্তি লাভেচ্ছায় নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে যোগতপস্যা মগ্ন থেকে কালাতিপাত করেন, তাঁরা আত্মনিষ্ঠ বা আত্মস্থ যোগী। মৌন যোগী যেমন পরজন্মে অসীম বাক্‌শক্তি লাভ ক'র্‌বার জন্যে এজন্মে মৌনব্রত অর্থাৎ বাক্ সংযমব্রত ধারণ করেন, এঁরাও তেমনি পরজন্মে বিপুল শক্তিতে জন সমাজকে ধরবার জন্যে এ জন্মে জনসমাজ পরিত্যাগ ক'রে নির্জ্জন অরণ্যে যোগ তপস্যায় দেহপাত করেন ; এঁরা যুক্ত যোগী।

(২) যাঁরা ভেদবুদ্ধিরহিত অবস্থায় সকলের মুক্তি আত্মমুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে তাহাদিগকে কর্ম্মের পথে, ধর্ম্মের পথে চালিত করেন, পরের শুভাশুভ নিজের শুভাশুভ বোধ করেন এবং পরের জন্য আত্ম-ভোলা ; এঁরা মুক্ত যোগী ; এঁরাই যোগীশ্রেষ্ঠ। কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ শেষোক্ত শ্রেণীর সাধক ছিলেন। জীবনকে সর্ব্বভূতের সেবায় বিনিয়োগ করাই হ'চ্ছে জীবনের সর্ব্বপ্রধান কাজ। সংসারে সকল রকম স্বার্থপরতার মূলই হ'চ্ছে দেহাত্মবুদ্ধি। "প্রেমাত্মিকা আসক্তির টানে আপনাকে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করাই বাস্তবিক আত্ম-সমর্পণ বা শরণাগতি।"

উপরে যে মায়াপাশের কথা বলা হ'ল, সে মায়া সম্বন্ধে 'যোগতত্ত্ব বারিধি' বলেন :—

"মায়ৈব বিশ্বজননী-নান্যাতত্ত্বাধিয়া পরা।
যদা নাশং সমায়াতি বিশ্বং নাস্তি তদা খলু॥"

অর্থাৎ মায়া হ'তেই এই বিশ্বভূত জগৎ সমুৎপন্ন হ'য়েচে। মায়াই এ বিশ্বজগতের জননী। তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই! সুতরাং আত্মজ্ঞান দ্বারা যখন মায়া বিলুপ্ত হয়, তখন সাধকের পক্ষে এই মিথ্যাভূত জগৎপ্রপঞ্চ কিছুই থাকে না।

"চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমান্বিতা।
তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা।
সত্ত্ব শুদ্ধ্য বিশুদ্ধিভ্যাং মায়া-বিদ্যে চ তে মতে॥"—পঞ্চদশী।

অর্থাৎ চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সংযুক্ত সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি সত্ত্বগুণের শুদ্ধির তারতম্যে মায়া এবং অবিদ্যা এই দুই প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বগুণ যখন তম ও রজ এই দুই গুণ দ্বারা কলুষিত হয়, তখন তাকে সত্ত্বগুণের অবিশুদ্ধি বা মলিন—স-ত্ত্ব প্রধান বলে। এতে বোঝা যাচ্ছে—ব্যষ্টিভূত মলিন সত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানই অবিদ্যা এবং সমষ্টিভূত শুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানই মায়া। অবিদ্যা ও মায়া পদার্থ দুইই এক; কেবলমাত্র প্রভেদ ব্যষ্টি ও সমষ্টি। যেমন ব্যষ্টিভূত বৃক্ষসমূহের সমষ্টিকে বন ব'লে নির্দ্দেশ করা যায়, সেইরূপ ব্যষ্টিভূত অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সমষ্টিকে মায়া ব'লে নির্দ্দেশ ক'রতে কোন আপত্তি হ'তে পারে না। সাঙ্খ্যের যে প্রকৃতি পুরুষ বিশ্বের বিকাশ, সেই প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে যে বর্ণনা আছে, তা প'ড়লে বোঝা যায় প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্যা এবং অজ্ঞান এই চতুষ্টয়ই সাধারণতঃ একার্থ প্রতিপাদক। আজ পর্য্যন্ত যিনি অনেকেরই নিকট সাধারণ ক্ষেপা বলিয়াই পরিচিত, সেই কাঙাল ক্ষেপাচাঁদের মুখে এই ভাবের তত্ত্বকথা কথায় কথায় শোনা যেত।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যা দাত্মনো মায়াং যথাভাবো যথা তমঃ॥"

শ্রীভগবান ব'ল্লেন, "হে ব্রহ্মণ! অর্থ অর্থাৎ পরমার্থভূত যে আমি, সেই আমি ভিন্ন যার প্রতীতি হয়, অর্থাৎ আমার স্ফুরণ হ'লে, আর

আপনা আপনি প্রতীতি বিষয়ীভূত হয় না অর্থাৎ আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে যার স্বতঃ প্রতীতি নাই, এই লক্ষণাক্রান্ত বস্তুকে আমার মায়াশক্তি ব'লে জেনো।"

"যত্র জীব তত্র শিব" এর অর্থ এই যে মায়াযুক্ত জীব মায়ামুক্ত হ'লেই শিব হন্। এ অধিকার সকল জীবেরই আছে।"

মায়া সম্বন্ধে বীর সাধক বামাক্ষেপা ব'লেচেন, "মায়া ত্যাগ ক'র্‌বি কি? মায়াই ত মা। যার মায়া নাই সে ত মানুষ নয়, সে রাক্ষস। মায়া ত্যাগ ক'র্‌লেই ত মানুষ মানুষ থেকে খারিজ হ'য়ে গেল। মায়া না থাক্‌লে জগৎ থাক্‌বে না। মায়া ত্যাগ করা ত পতিত হবার লক্ষণ। মায়া থা'ক্‌লেই মহামায়ার কাজ ভালো ক'রে করা যায়।

মায়া রাখ্‌তে হবে, তবে তাকে জয় ক'রে রাখ্‌তে হবে। তার বশে যাবে না। মায়া ত্যাগ নয়, মায়া জয় কর্ত্তে হবে। তা হ'লেই মহামায়াকে পাবে।" ধর্ম্ম কি? এবং তা কোন্ পথে? তা বুঝিয়ে বলা সঙ্কীর্ণ জ্ঞানসাধ্য নয়;—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"। তবে ধর্ম্মমর্ম্মবোদ্ধা মহাত্মাগণের জ্যোতির্ম্ময় জীবন চরিত পাঠ ক'রে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ ক'রেছি তা এই:—ধর্ম্ম শব্দ ধৃ ধাতু হ'তে নিষ্পন্ন। যে ধারণ করে, সেই ধর্ম্ম,—যে যাকে ধারণ করে সেই তার ধর্ম্ম। দ্রব্যের স্বভাবকে ধর্ম্ম বলে; যেমন দীপ্তি—চন্দ্র সূর্য্যের ধর্ম্ম, রস—জলের ধর্ম্ম, দাহন—অগ্নির ধর্ম্ম, সেই প্রকার আত্মজ্ঞানই মানব ধর্ম্ম। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ব'লেচেন, "আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়া:—"আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ় নিরন্তর নরক ভোগ করে। ধর্ম্মানুগত হওয়া মানব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য; নইলে মানুষের মনুষ্যত্ব কোথায়? আন্তরিক ভগবদ্বিশ্বাস ও ভগবদ্ভক্তিই ধর্ম্মের মূল।

বারিধি' বলেন, ভক্তি ও বিশ্বাস যমজ সন্তান। আগে বিশ্বাস ভূমিষ্ঠ হয় তার পরেই ভক্তি। যমজ সন্তানের ধর্ম্মই এই—একের ব্যাধি হ'লে অন্যের হয়; একের সুখ হ'লে অপরের হয়। বিশ্বাস ও ভক্তিতেও সেই ধর্ম্ম বিদ্যমান। বিশ্বাস যেখানে দৃঢ় ভক্তিও সেখানে দৃঢ়া। বিশ্বাস যেখানে গিয়েচে ভক্তিও সেইখানে গিয়ে উপস্থিত। ভক্তি মেয়ে—তার বিচার ক্ষমতা কম,—বিশ্বাস যেখানে যায় না সেও সেখানে যায় না।

বিশ্বাস যেখানে যায় ভক্তিও সেইখানে গিয়ে হাজির হয়। ভক্তি বিচার বিতর্ক বোঝে না—বিশ্বাস গেলেই সে যাবে। বিশ্বাস পুরুষ—কাজেই তার একটু বিচার বিতর্ক আছে বৈ কি। কিন্তু অধিক গোল-যোগের মধ্যে সেও থাক্‌তে চায় না। তার কেমনই স্বভাব,—সে নীরবতা নিস্তব্ধতাই ভালোবাসে। যেখানে অধিক কথা কাটাকাটি—যেখানে অধিক মাথা খাটাখাটি, যেখানে অধিক দন্ত কিচিমিচি, যেখানে কূট তর্কের হিজিমিজি, বিশ্বাস সেখানে থাকে না! সে চায় শুদ্ধ, বুদ্ধ, সরল স্থান। সেই স্থানে সবটুকু জায়গা সে একা অধিকার ক'রে ভগ্নীকে নিয়ে ব'সে থাক্‌বে। দ্বিতীয় কথা যেখানে ভক্তি সেইখানে ধর্ম্ম, যেখানে ধর্ম্ম সেইখানে শ্রীভগবান বিরাজিত। শ্রীভগবান ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রেই ধর্ম্মপক্ষের সারথ্য স্বীকার ক'রে পবিত্রতম পাঞ্চজন্য শঙ্খের গভীর নিনাদে চকিত অধর্ম্মপক্ষকে জানিয়ে দেন,—

"সাধু সজ্জনে রক্ষা করিতে, দুষ্কৃতগণে করিতে নাশ,
জাগাইতে পুন সুপ্ত ধর্ম্মে যুগে যুগে হই স্ব পরকাশ।"

—পাঞ্চজন্য।

এবং জগদ্দ্যোষিত করেন, "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"—
সেই পক্ষেরই জয়—'যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।'

ক্ষেপাচাঁদের সাধন সিদ্ধির সম্বল। গানের ছন্দে প্রায়ই তাঁর মুখে শোনা যেত,—

"মহিষ, মেষ, ছাগ, আদিক বলি—ভাগ, ছয় রিপু হয় অষ্টপাশে যোজন।
নিবৃত্তি খুটোয় ধ'রে, বিরাগ কর্ম্মকারে, বিশ্বাস-খড়্গ দ্বারে করে
যেন ছেদন ॥"

শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য্য তাঁর বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে ব'লেচেন্,

"মোক্ষ কারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্ব-স্বরূপানু সন্ধানং ভক্তিরিত্যাভিধীয়তে ॥"—অর্থাৎ

মোক্ষলাভের সমস্ত উপায়ের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বপ্রধান। আত্মার স্বরূপ-অনুসন্ধানের নামই ভক্তি।

প্রাণে উৎকট ধর্ম্ম পিপাসা জাগ্‌লেই, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হবার জন্যে প্রবল বাসনা উদয় হ'লেই, বাঞ্ছাকল্পতরু জগদ্‌গুরু জ্ঞানময় গুরুরূপে উপস্থিত হ'য়ে দিব্যদৃষ্টি দান করেন। সদ্‌গুরু কৃপায় ক্ষিপ্ত ও মূঢ় এই দুই মনোবৃত্তি ত্যাগের অধিকারী হ'য়ে, হৃদয় ও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন ক'রে, সংযম সহায়ে আত্মবশীভূত করাই মনুষ্যত্বের প্রথম সাধনা। তার পর ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রথম সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে, ক্রমে ক্রমে বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে উদারভাবে মিলিত হ'য়ে, বিশ্বহিতে আত্মোৎসর্গ ক'র্‌তে পার্‌লেই সকল বিচিত্রতার মধ্যে সাক্ষাৎ ভগবানেরই অস্তিত্বদর্শন ঘটে, যিনি সত্য-শিব-সুন্দর। সেই শ্যামসুন্দর চিদ্‌ঘনরূপ দর্শন ঘট্‌লে সাধক তাঁতে অচলা ভক্তি ও অহেতুক প্রেম সম্পন্ন হন্। তখন সারূপ্য, সাযুজ্য, আর যাহা কিছু সমস্তই লাভ হয়। তখনই সাধকের আদ্যন্ত মধ্য-হীন চরাচর বিশ্বব্যাপী সত্য স্বরূপের সত্যজ্ঞানালোকে অসত্য-অন্ধকার বিনষ্ট হয়, শিব-সুন্দরের প্রেমে অশিব-অসুন্দর দূরীভূত হয়।

সাধনার দুই পথ—নিবৃত্তি আর প্রবৃত্তি। নিবৃত্তি যোগ, প্রবৃত্তি ভোগ। নিগম-উক্ত সাধনা নিবৃত্তির পথে আর আগম-উক্ত সাধনা প্রবৃত্তির পথে। যাঁদের ভোগ-বাসনা পূর্ণ হ'য়েছে, তাঁদের নিবৃত্তির পথ যোগ ; আর যাঁদের ভোগেচ্ছা-চরিতার্থ হয় নাই, তাঁদের জন্যে জগদ্‌গুরু তন্ত্রের সাধনা প্রচার ক'রেচেন। প্রবৃত্তিমার্গ দিয়ে নিবৃত্তিমার্গে আনাই এর উদ্দেশ্য। দেবাদিদেব মহাদেব সর্ব্বেশ্বরী শঙ্করীর কাছে তন্ত্রশাস্ত্র ব্যক্ত ক'রেচেন তা আজকাল কতকগুলো কপটাচারী অনধিকারীর দ্বারা অযথা ব্যবহৃত হ'য়ে সাধারণ লোকের ঘৃণাভরা দৃষ্টির মধ্যে এসে প'ড়েচে। "তন্ত্র বা আগম শাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত। (১) পঞ্চরাত্রাগম (২) শৈবাগম (৩) শাক্তাগম। প্রথম আগমে বিষ্ণুর, দ্বিতীয় আগমে শিবের এবং তৃতীয় আগমে শক্তির পূজা বিহিতরূপে লিখিত হ'য়েচে।"

—যোগতত্ত্ব বারিধি।

ভগবান শঙ্কর অধুনা অল্পায়ু কলির জীবের পক্ষে তন্ত্রমতে শক্তি-সাধনা ক'রে আশু সিদ্ধিলাভের উপায় নির্দ্দেশ ক'রে দিয়েছেন। "শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবী মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে।" শক্তির সাধনা ভিন্ন মুক্তির আশা হাস্যজনক। শক্তি ত আগে দরকার, তা না হ'লে অগ্রসর ক'র্‌বে কে ? সাধনায় অগ্রসর হওয়াই যায় না।

বদ্ধজীব যখন শাস্ত্রপাঠে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে প্রকৃতির বাহুপাশ হ'তে মুক্ত হবার জন্যে সাধনা করে, তখন সে শক্তি-উপাসক শাক্ত। আর যখন সাধন ভজন শেষ ক'রে মায়ামুক্ত হ'য়ে, সেই নিত্য-নিরঞ্জন পরমানন্দ চিদ্ ঘন ব্রহ্মের প্রেমমাধুর্য্যরসে নিমগ্ন হ'য়ে যায়, তখন সে পরম বৈষ্ণব। শাক্ত ও বৈষ্ণব ভিন্ন নয়, এক। যিনি পরম শাক্ত, তিনিই যথার্থ

সাধনা থাকে না, ঈশ্বর সত্তায় একেবারে ম'জে যায়—তাঁর স্বরূপ শক্তিপ্রাপ্ত সোহং হ'য়ে যায়। তখন কাজ থাকে না, কামনা বাসনা থাকে না, কাজেই আর শক্তির দরকার হয় না। তখন আমিত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁতে মিশে যায়। ভক্ত ও ভগবানের এই অভেদগত মিলনের নাম "রমণ"। এই অবস্থাকে ভাব সমাধি বলে। এই অবস্থায় আস্‌তে পার্‌লেই মানুষ দেবতা। শক্তি ভিন্ন মুক্তি নাই। দুর্ব্বল দেহে মাতৃশক্তির সঞ্চার না হ'লে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হ'তে পারে না। মা বিরূপ হ'লে সন্তানের আশা ভরসা নাই। ব্রহ্মময়ী মা ব্রহ্মেরই চিৎশক্তি ; তাঁকে জান্‌তে পার্‌লে তবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে, কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তিনি শব-সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রেছিলেন। শবসাধনা, চিতাসাধনা, যোগিনীসাধনা, ভৈরবীসাধনা ও শ্মশানসাধনা এই কয় সাধনাকেই তন্ত্রে বীর সাধনা বলে।।

শাস্ত্রবাক্যের মর্য্যাদা রেখে আমরা শবসাধনায়-সিদ্ধ কাঙাল ক্ষেপাচাঁদকে বীর সাধক ব'ল্‌তে পারি।

তান্ত্রিক সাধক বামাক্ষেপা তন্ত্র সম্বন্ধে ব'লেচেন, "তন্ত্রে আন্তরিক কিছু নাই। সবই বাহ্যিক ; বাহ্যিক কর্ম্মে কর্ম্মে আন্তরিক আপনি হয়। যেমন স্বপ্ন দেখা—আগে প্রত্যক্ষ করা আছে, তাইত স্বপ্নে দেখা হয়। সামান্য অধিকারীর পক্ষে মহা নির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার প্রবৃত্তির পথে, আর আগমসারোক্ত পঞ্চমকার নিবৃত্তির পথে। সধবা নারীর পতি প্রেম আর বিধবা নারীর প্রতিপ্রেম যেমন তফাৎ, এও সেই রকম। "রাধিকা বৃন্দাবনে যখন কেলে ঠাকুরটীর সঙ্গে খেলা ক'র্‌তেন, তখন তাঁর মহানির্ব্বাণ তন্ত্রাদির ভাব ; আর যখন কেলে ছোঁড়া মথুরায় চ'লে গেল—তখনকার ভাব আগম সারাদির ভাব।"

ভালবাসা দুই প্রকারে নিবৃত্তি হয় ; এক বাঞ্ছিতকে লাভ ক'রে, অপর তাঁকে চিন্তা ক'রে। বাঞ্ছিতকে লাভ ক'রে যা, তা প্রবৃত্তিমার্গে ; আর তাঁকে চিন্তা ক'রে যে তৃপ্তি তা নিবৃত্তিমার্গে। যোগিগণ প্রাণায়াম যোগে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগায়, আর তান্ত্রিকগণ পঞ্চমকারের দ্বারা সহজে তা জাগাতে পারে। মদ খেলে জাতিপাত হয়। মদ খেয়ে নাৎলামি করা বা কোন রকম খারাপ আচার ব্যবহার করা,কোন তন্ত্রের কোথাও লেখা নাই। তান্ত্রিক সাধনায় অভিষেক আছে। অভিষেক মানে গুরু শিষ্যকে উপযুক্ত মনে ক'র্‌লে এক পদ থেকে অন্য পদে তুলে দিতে পারেন ; সেই তুলে দেবার নাম অভিষেক।

অভিষিক্ত শিষ্য না হ'লে পঞ্চমকারের অধিকারী হ'তে পারে না। এমন কি ছুঁলে নরকে পচ্‌তে হয়। গীতার ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রও অপৌরুষেয়, ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত। তবে শুধু কলিতে কেন, এ চিরকালই আছে, তা না হ'লে বশিষ্ঠদেব সিদ্ধ হ'লেন কিসে? সেত এ যুগের কথা নয়। শুধু পঞ্চমকারের অধিকার কেন, সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত কোন যোগসাধনাতেই কোন ফলই হয় না। "দীক্ষা গ্রহণ সকলেরই দরকার কিনা?"—এ প্রশ্নের উত্তরে সাধক বামাক্ষেপা ব'লেচেন, "দরকার ব'লে দরকার, খুব দরকার। ক, খ, না শিখে একেবারে বড় বই প'ড়্‌তে পারা যায়? মন্তোর গ্রহণ করা দরকার। মন—তোর = মন্তোর = মন্ত্র। তোর মন নানা দিকে ঘুরে বেড়িয়ে বার ফট্‌কা হ'য়ে প'ড়েছে, সে আর তোর নেই, তাকে তোর নিজের করবার জন্যে, কেবল বশে রাখ্‌বার জন্যে, মন্তোর নেওয়া দরকার। গুরু-মন্তোর জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে—তোর মন যেমন পর হ'য়ে গিয়েছিল, সে আবার তোর হ'য়ে প'ড়্‌বে। মন তোর নিজের না হ'লে ত আর

যোগশক্তি প্রাপ্ত হ'তে হ'লে, ধর্ম্মজীবন লাভ ক'র্‌তে হ'লে, গুরু-করণের আবশ্যকতা আছে। সঞ্জীবনী-সুধা শক্তিসম্পন্ন সদ্‌গুরুর নিকট ভিন্ন পাওয়া যায় না। শাস্ত্র বলেন :—

"ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্র সমুদ্ভবা।
অন্যথা ফলহীনাস্যান্নির্বীর্য্যা চাতি দুঃখদা।
গুরুং সন্তোষ্য যত্নেন যো বৈ বিদ্যামুপাসতে।
অবিলম্বেন বিদ্যায়াস্তস্যাঃ ফলম বাপ্নুয়াৎ॥
গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো ন সংশয়ঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তস্মাৎ শিষ্যৈঃ প্রসেবতে॥
গুরু প্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ॥"

—যোঃ তঃ বাঃ—

যোগবিদ্যা গুরুমুখ হ'তে লাভ ক'র্‌তে হয়, তা হ'লে বিদ্যা বীর্য্যবতী হয়,—গুরুর উপদেশ ব্যতীত যোগসাধনে নিযুক্ত হ'লে তা নির্ব্বীর্য্যা ও দুঃখপ্রদায়িনী হ'য়ে থাকে। সুতরাং তাতে কোন ফলই হয় না। যিনি যত্নবান হ'য়ে গুরুকে প্রীত ক'রে, তাঁর উপদেশ অনুসারে যোগ সাধন করেন তিনি শীঘ্রই সে সাধনার ফল লাভ করেন। গুরুই পিতা, গুরুই মাতা এবং গুরুই দেবতা স্বরূপ। এই কারণে সাধকগণ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে গুরুশুশ্রূষা ক'রে থাকেন।

কাঙাল ক্ষেপাচাঁদের 'পঞ্চদশমুণ্ডী' সিদ্ধাসন সম্বন্ধে শোনা যায় সে স্থান অতিশয় তেজ ও শক্তিসম্পন্ন। বৎসর বৎসর বহু ভাবের বহু সাধক এখানে আসেন। এক বৎসর এক সাধু এসে ঐ আসনে বস্‌বার অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় আসন-রক্ষক উক্ত আসনের অসাধারণ তেজ ও

করেন এবং সাধুও সেখান থেকে চ'লে যান। কিন্তু বিপরীত পথে প্রবেশ ক'রে উক্ত সাধু কখন যে আসনে গিয়ে ব'সেচেন তা কারও লক্ষ্য হয় নাই ; পরক্ষণে দেখা যায় তিনি মূর্চ্ছাপন্ন অবস্থায় অনড়ভাবে আসনের উপর প'ড়ে রয়েচেন। সেখান থেকে তাঁকে তুলে এনে বহু শুশ্রূষা করার পর তিনি চৈতন্য লাভ করেন এবং এই ব'লে চ'লে যান্, "হাঁ! শক্ত জায়গা।" শক্তিসম্পন্ন প্রকৃত সাধু না হ'লে সিদ্ধাসনে কেউ ব'সে থাক্‌তে পারেন না কেন? এ কথা বামাক্ষেপার ভক্তগণ একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "ব'স্‌তে জানা চাই। আসনের যেথানে সেখানে ব'স্‌লে চ'ল্‌বে না, তা হ'লে নিশ্চয়ই বিঘ্ন ঘ'ট্‌বে। আসন-মধ্যস্থিত মুণ্ডের মস্তকে সহস্রার পদ্ম আছে, সেই পদ্মের সহিত সাধকের গুহ্যস্থিত মূলাধার পদ্মের সংযোগ ক'রে ব'স্‌তে পার্‌লেই আর কোন ভয় থাকে না।"

আগেই বলা হ'য়েছে, কঠিন রোগগ্রস্ত বহু ব্যক্তি কোন চিকিৎসায় কোন ফল না পেয়ে অবশেষে জীবনের আশা প্রায় পরিত্যাগ ক'রেই কাঙাল ক্ষেপাচাঁদের নিকট এসে চিরারোগ্য লাভ ক'র্‌তেন এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রোগমুক্তির পর প্রায় সকলেরই মনে প্রবল ধর্ম্মভাব ও পরমেশ্বরের প্রতি অকপট ভক্তি জেগে উঠ্‌ত। "ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে অপরের শরীরে ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত ক'র্‌বার ক্ষমতা আধ্যাত্মিক জীবনে অতি অল্প সাধকের ভাগ্যে লাভ হ'য়ে থাকে।"—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ।

রোগ যন্ত্রণায় অব্যাহতি পাবার ব্যাকুলতায় কোন রোগী কাছে এলে প্রথমেই তিনি নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে তাকে বিদায় ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌তেন। কিন্তু নিতান্ত নাছোড়বান্দার মত কাতর-

অমোঘ বাক্যমাত্রে, কাকেও বা পবিত্র স্পর্শদানে আরোগ্য পথে নিয়ে আস্তেন। নীচের কয়েকটী মাত্র ঘটনা থেকেই তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে।

(১) বীরভূম জেলার পুরন্দরপুর নিবাসী ৺ উত্তমদাস দত্ত মহাশয় তাঁর মধ্য জীবনে উৎকট ধাতুক্ষয় রোগাক্রান্ত হ'য়ে ক্রমবর্দ্ধিত রোগযন্ত্রণায় যার পর নাই কাতর হ'য়ে শয্যাগত হ'য়ে পড়েন। শ্রীমন্ত পরিবারে তাঁকে রোগমুক্ত ক'র্‌তে চিকিৎসাদির কোন ত্রুটিই হয় নাই। পরিজনবর্গের প্রাণপণ যত্ন এবং অজস্র অর্থব্যয় সত্ত্বেও ব্যাধি ক্রমেই অসাধ্য হ'য়ে ওঠে। উপায়বুদ্ধি হারিয়ে সকলেই হতাশ হ'য়ে পড়েন। নিরুপায়ের উপায় ভগবানের অনুগ্রহে একদিন একজন প্রস্তাব করেন, "একবার কাঙাল ক্ষেপার কাছে গিয়ে দেখ্‌লে হয় না?"—সকলের বিশ্বাস কিছু সমান নয়! দুই একজন এই প্রস্তাবে অমত জানালেও অবশেষে কিন্তু রোগীকে ক্ষেপাচাঁদের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথম দর্শনেই তিনি "যা! ভালো হ'য়ে যাবে" এই আশ্বাস দিয়ে তাঁদের বিদেয় দেন। মহাপুরুষের বাক্য কখনও বিফল হবার নয়। রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য পথে আস্‌তে আস্‌তে কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ ক্'রে অটুট-স্বাস্থ্য-সুখ উপভোগ করেন। মহাপুরুষগণের অলৌকিক শক্তিতে কি না ঘ'ট্‌তে পারে?—

(২) উপরোক্ত পুরন্দরপুরের নিকটবর্ত্তী কোমা গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ তথাকথিত 'শিবের অসাধ্য শূলরোগে আক্রান্ত হ'য়ে নিরতিশয় কাতর হ'য়ে পড়েন। এই সময় অন্ন খাবার জিনিষ ত দূরের কথা, এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত তাঁর পেটে থাক্‌ত না। খাওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে বমি হ'য়ে যেত। একে উৎকট রোগের যাতনা, তার উপর দীর্ঘকাল

অতি কাতরভাবে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করেন। ক্ষেপাচাঁদ প্রথমে তাঁর কথায় কর্ণপাতও করেন না। তিন দিন এইভাবে কেটে যায়; ইনি যতই ধরাধরি করেন, উনি ততই যেন বিরক্ত হ'য়ে স'রে পড়েন। কোন রকমে তাঁকে বিদেয় ক'র্‌তে না পেরে, ক্ষেপাচাঁদ যেন উগ্রমূর্ত্তি ধ'রেই ব'ল্‌লেন, "বামুনের ছেলে স্বভাব খুইয়ে যা কুকাজটা ক'রেচিস্! তোর অম্বলশূল হবে না ত হবে কার?"—এ কথায় ব্রাহ্মণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন; কি যে তাঁর ব্যাধি, সে বিষয়ে কোন কথাই ত তিনি খুলে বলেন নাই বা ক্ষণিকের দুর্ব্বলতাগত তাঁর অমানুষিক কুকাজের কথা আজ পর্য্যন্ত লোক সমাজে গোপনই থেকে গিয়েচে। "মহাপুরুষ কি অন্তর্য্যামী?—" এই ভেবে তাঁর পায়ের তলায় প'ড়ে পা দুখানি জড়িয়ে ধ'র্‌লেন। মহাপুরুষের অন্তর আর্ত্তের কাতরতায় কতক্ষণ স্থির থাকতে পারে?—উহা যে তাঁদের জন্ম পরিগ্রহের মূল কারণ। কাঙালের ভরসা কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ ব্রাহ্মণের পেটে পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিয়ে আরোগ্য লাভের আশ্বাস দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য অনতি-বিলম্বেই উক্ত ব্রাহ্মণ অসাধ্য-রোগ-মুক্ত হ'য়ে দিব্য স্বাস্থ্য লাভ করেন এবং যদৃচ্ছা আহার ক'রেও ভবিষ্যতে কোন দিনের জন্যও অসোয়াস্তি ভোগ করেন নাই।

(৩) বর্দ্ধমান জেলার কামারপাড়া গ্রামের জনৈক কর্ম্মকার বহুদিন যাবৎ কঠিন হাঁপানি কাস রোগে ভুগতে থাকেন। কত চিকিৎসা, কত স্থানে যাতায়াত, কত কবজাদি ধারণ, কিছুতেই কিছু ফল হয় না; দেহ তাঁর ক্রমেই কঙ্কালসার হ'য়ে পড়ে। ব্যাধি একদিন এমন বৃদ্ধি হয় যে, যে কোন মুহূর্ত্তে রোগীর মৃত্যু সম্ভাবনা ভেবে পরিজনবর্গ শেষ আশাটুকুও ছেড়ে দেন এবং বাড়িতে কান্নাহাটি প'ড়ে যায়। চক্রধরের চক্র বোঝা

দিয়ে আপন মনেই কোথায় যাচ্ছিলেন ; মাঝে মাঝে তিনি এই রকম গ্রামগ্রামান্তরে গিয়ে; ঘৃণায় বা ভয়ে যে স্থানের পাশ দিয়েও কেউ যেতে চাইত না, প্রায়ই সেই সব পরিত্যক্ত জায়গায় কিছু সময় কাটিয়ে আস্‌তেন ; কি উদ্দেশ্যে কে জানে ? এ সংবাদ কর্ম্মকার বাড়িতে পৌঁছিলে কয়েকজন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে ক্ষেপাচাঁদের পদতলে প'ড়ে তাঁর গতি রোধ করে এবং রোগ ও রোগীর অবস্থা সবিশেষ জানিয়ে রোগীর বাড়িতে অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার পদধূলি দেবার জন্যে কাতরভাবে ধ'রে বসে। সকলেরই তখন দৃঢ় বিশ্বাস যে ক্ষেপাচাঁদের অনুগ্রহে না সাড়ে এমন ব্যাধিই নাই। ক্ষেপাচাঁদ তাদের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কর্ম্মকার বাড়িতে পৌঁছিলেন এবং রোগীর মাথায় পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিয়ে আরোগ্য-লাভের আশীর্ব্বচন দিয়ে বিদায় গ্রহণ ক'র্‌লেন। মহাপুরুষের পবিত্র স্পর্শলাভের পর মুহূর্ত্ত থেকেই রোগীর অবস্থা বিপরীত পথে ফিরে যায় এবং কিছুদিন মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে।

(৪) জয়দেব কেন্দুলি নিবাসী রাধাকৃষ্ণ চট্টোরাজ মহাশয় একবার জ্বর রোগে ৫ বৎসরের উপর ভুগ্‌তে থাকেন। বহু চিকিৎসাতেও কোন ফল হয় না—সে সময় প্রত্যহ বৈকালেই তাঁর জ্বর আস্‌ত এবং আন্দাজ এক প্রহর রাত্রির সময় জ্বর ছেড়ে যেত। চট্টোরাজ ম'শায় সেলাইয়ের কাজ ভালো জান্‌তেন। একদিন বৈকালে ক্ষেপাচাঁদের আশ্রমের পাশ দিয়ে আস্‌বার সময় ক্ষেপাচাঁদ তাঁকে কি একটা সেলাই ক'রে দিয়ে যেতে বলেন। চট্টোরাজ ম'শায় বলেন যে আজ আর প্রায় জ্বর আসবার সময় হ'য়ে এসেচে,—কাল প্রাতঃকালেই এসে সেলাই ক'রে দিয়ে যাব। ক্ষেপাচাঁদ হাসিমুখে বল্লেন, "জ্বরের জন্যে ভাবনা কি ? জ্বর আর না এলেই তো হ'লো ?—" এ কথায় চট্টোরাজ ম'শায় আর

দিন থেকে তাঁর জ্বরও একেবারে ছেড়ে যায়। এই রকম বহু বহু অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা এ দেশের অনেকেরই অবিদিত নাই। ক্ষেপাচাঁদের অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেবার জন্যে কয়েকজন প্রত্যক্ষ দর্শীর নিকট হ'তে শোনা আরও তিনটি ঘটনা উল্লেখ ক'র্‌চি :—

(১) একদিন প্রাতঃকালে আশ্রমে ব'সে কয়েকজন সেবক শিষ্য-সহ সদালাপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ক্ষেপাচাঁদ হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক ও চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন। শিষ্যগণ সে ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, "ঘরে আগুন ধ'রে সুরাই গাঁয়ের কতকগুলো গরীব গেরস্ত একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে গেল। নিরুপায় হ'য়ে তারা আমার কাছেই আসচে। এখন কি দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করি তাই ভাব্‌চি।" এই ব'লে সেই রকম চঞ্চল ভাবেই উঠে পড়েন এবং তাদের দেবার মত আশ্রমের কোথায় কি আছে না আছে দেখ্‌তে আরম্ভ করেন। শিষ্য-গণ তাঁর অলৌকিক প্রভাবে বিস্মিত ও মুগ্ধ হ'য়ে গেল, যখন পরদিন বেলা আন্দাজ দুই প্রহরের সময় সত্য সত্যই সেই সমস্ত লোক সেখানে উপস্থিত হ'য়ে ক্ষেপাচাঁদকে ঘর পোড়ার দুরবস্থার কথা জানিয়ে তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইল। শিষ্যগণের বিস্মিত হবারই কথা। কোথায় জয়দেব কেন্দুলি, আর কোথায় সুরাই গাঁ—রামপুরহাট সাবডিভিজানের অন্তর্গত। সেখানকার কোন সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে এখানে পৌঁছ্‌বার কোন সম্ভাবনাই নাই। চাল, ডাল, কাপড়চোপড়, পয়সা প্রভৃতি যা কিছু আশ্রমে সঞ্চয় ছিল, ক্ষেপাচাঁদ সে সমস্তই ক্ষতি ও অভাবের তারতম্য হিসাবে তাদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিলেন। তারা আশাতীত অনুগ্রহ লাভ ক'রে ক্ষেপাচাঁদের জয়গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লে গেল।

(২) একদা জনৈক ভদ্রলোক ক্ষেপাচাঁদের অলৌকিক শক্তির

ক'র্‌তে আসেন। তখন বর্ষাকাল; বৈকাল থেকে অতিরিক্ত বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় তিনি ক্ষেপাচাঁদের আশ্রয়ে রাত্রিবাস ক'র্‌তে বাধ্য হন্। প্রাতঃকালে বিদায় নিয়ে ঘাটে পৌঁছে দেখেন যে প্রবল বন্যায় অজয় যেন দুকূল ছাপিয়ে ছুটতে চাচ্চে; পারে যাবার কোন উপায়ই নাই। তিনি কূলে দাঁড়িয়ে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লেন; তাঁর দুর্ভাবনার কূল কিনারা নাই। অজয়ের প্রবল বন্যার বেগ প্রথমেই যে বুক পেতে সইতে হয় তাঁদের গ্রামকে; না জানি এতক্ষণ কি সর্ব্বনাশই না হ'য়ে গিয়েচে, এই ভেবে তিনি উর্দ্ধশ্বাসে ক্ষেপাচাঁদের নিকট ফিরে যান এবং সম্ভব্য বিপদের কথা জানিয়ে পারের উপায় ক'রে দেবার জন্যে তাঁকে অতি কাতরভাবে ধ'রে বসেন। ক্ষেপাচাঁদ বলেন, "ভাবনা কি? বান এবার তোদের গাঁমুখো যাচ্ছে না ত!" কথাটা এমন ভাবে ব'ল্‌লেন যে সহজে বিশ্বাস করা শক্ত; যেন এ বিষয় নিয়ে অজয়ের সঙ্গে তাঁর কতই না পরামর্শ হ'য়ে গিয়েচে। এই কথায় এবং আরও অনেক প্রবোধ বাক্যে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে না পেরে ক্ষেপাচাঁদ অবশেষে ব'ল্‌লেন, "কদমখণ্ডীর ঘাটের বাঁ পাশ দিয়ে নেমে গিয়ে দ্যাখ দিকিন! বোধ হয় এখনও পেরুতে পার্‌বি। বিপুল বিস্ময়ে ক্ষেপাচাঁদের প্রতি উক্ত ভদ্রলোকের ভক্তির অবধি রইল না—যখন তিনি যথাদিষ্ট পথে বর্ষার ভরা অজয় অনায়াসে অতিক্রম ক'রে পরপারে পৌঁছুলেন এবং সন্দিগ্ধ স্থলে গিয়ে দেখ্‌লেন যে বানের জল কে জানে কোন্ ভাঙনের সাহায্যে ভিন্ন পথে ছুটেচে;—তাঁদের গাঁয়ের সীমানাও স্পর্শ করে নাই।

(৩) বীরভূম জেলার বাতকের গ্রামের হরিভক্তিপরায়ণ ৺মদন বাবুদের বাড়ি তিনি মাঝে মাঝে যাতায়াত ক'র্‌তেন। তাঁরাও

বৎসর পাঁচের একটি মেয়ে—নাম সরোজিনী, তাঁর সঙ্গ ছাড়ত না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপাচাঁদের প্রতি তার ভক্তিও বাড়ে। ক্রমে তার বিবাহ হয় ও কিছুকাল পরে গর্ভবতী হয়। সেই অবস্থায় একদিন ক্ষেপাচাঁদের নিকট প্রার্থনা করে—"শুনেছি, প্রসববেদনা অসহ্য ; বাবা! সেই সময় একবার দর্শন দিয়ে প্রাণ বাঁচাবেন।"

যথাকালে একদিন তার প্রসব বেদনা আরম্ভ হয় ; কিন্তু ক্ষেপাচাঁদ কেন এলেন না সেই বেদনা তার প্রসব বেদনাকেও ছাপিয়ে ওঠে এবং অতি কাতরভাবে ক্ষেপাচাঁদকে ডাকতে আরম্ভ করে। পর মুহূর্ত্তেই ভক্তভয়হারী ক্ষেপাচাঁদ তাদের বৈঠকখানায় হাজির হন্। সেখানে সমবেত সকলের মনে বিস্ময় ও আনন্দ যেন আর ধরে না। ক্ষেপাচাঁদ বাইরে বেশিক্ষণ না দাঁড়িয়ে সরোজিনীর নাম ধ'রে ডাকতে ডাকতে ভিতর বাড়িতে তার কাছে যান্। অভয় আশীষ দিয়ে বৈঠকখানায় ফিরে আসামাত্র সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌছুল "নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব হ'য়েচে ; প্রসূতির তেমন কোন বেদনাই অনুভূত হয় নাই।" বৎসর কতক পরের কথা, ক্ষেপাচাঁদ তখন দেহরক্ষা ক'রেচেন। সন ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে উক্ত সরোজিনী বর্দ্ধমান মহাজন টুলির বাসায় স্বামীর সঙ্গে বাস করবার সময় কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ স্বামীর উপর দারুণ অভিমান ক'রে আত্মহত্যার সঙ্কল্প করে ও কোন কৌশলে এক ভরি আফিম আনিয়ে রেখে দেয়—ইচ্ছা যে দুপুরবেলায় খাওয়া দাওয়ার পর স্বামী বাসা হ'তে বাইরে বেরিয়ে গেলে সেই সুযোগে খাব। বেলা আন্দাজ দেড় প্রহরের সময় এক সন্ন্যাসী এসে ভিক্ষা চান্। চাল্, ডাল, পয়সা ইত্যাদি যা কিছু ভিক্ষা দিতে যায়, সন্ন্যাসী একে একে সবই প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে তিনি কি ভিক্ষা চান্ জিজ্ঞাসা করায়

আন্দাজ আফিম এনে দাও। এই কথায় সে হতভম্বের মত সেই এক ভরি আফিম এনে সন্ন্যাসীর হাতে না দিয়েই পারল না। সন্ন্যাসীও আফিমটুকু নিয়েই চ'লে গেলেন। সাত পাঁচ ভাব্‌তে ভাব্‌তে সে সন্ন্যাসীর পিছু পিছু কয়েক পা গিয়ে দেখে যে তার বাল্যগুরু ক্ষেপা-চাঁদের মূর্ত্তি সেই হাব ভাব সেই চলনে চ'লে যেতে যেতে সহসা যেন অন্তর্হিত হ'য়ে গেলেন। অলি গলি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান ক'রেও আর কোথাও সে সন্ন্যাসীকে দেখা গেল না। সরোজিনী দাসী এখনও জীবিতা—তাঁর পিত্রালয়ে বাস করেন; তাঁর পুত্রের নাম—শ্রীবিপদ-বারণ মজুমদার।

গানে ক্ষেপাচাঁদের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। গান রচনাতেও তাঁর যেমন শক্তি ছিল, তেমনি শক্তি ছিল সুর সহায়ে ভিন্ন ভিন্ন গানের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশে। তিনি অতি চমৎকার বেহালা বাজাতে পারতেন; যাঁদের স্বকানে শোন্‌বার সৌভাগ্য ঘ'টেছিল স্থানীয় এমন বহুলোকের নিকট শোনা যায় যে সে রকম মনোহর বেহালার বাজনা সাধারণতঃ শোনাই যায় না। মাঝে মাঝে যখন বেহালাখানি টেনে নিয়ে তন্ময়-ভাবে বাজাতে বস্‌তেন শোনা যায় তখন অতি বড় পাষাণ চিত্তও গ'লে যেত। মহাপুরুষগণের এক লক্ষণই এই যে তাঁরা যে কোন সাধনাতেই রত হন্‌, তাতেই অলৌকিক শক্তির পরিচয় রেখে যান্‌। অবিশ্বাসের বিষে জর জর আমরা মহাপুরুষগণের অসাধারণ শক্তির কথায় বিশ্বাস স্থাপনের প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে ব'সেচি। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস শ্রীভগবদ্বাক্য অনুবাদ ক'রেচেন, "আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন, "আত্মা হইতে কৃষ্ণ 'ভক্ত বড়' করি মানে।" হায়! হতভাগ্য আমরা! আজ দুষ্প্রবৃত্তি দুর্ব্বলতার

পবিত্রজীবনী পড়্‌বার শোন্‌বার প্রবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে অকিঞ্চিৎকর বই প'ড়ে কিম্বা পরনিন্দা, পরের অহিত চর্চ্চায়, অমূল্য জীবনের শুভ অবসর অতিবাহিত করি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য' পুস্তকে লিখেচেন যে সমস্ত বাধার ভিতর দিয়ে যেখানে মানুষের ধর্ম্ম সমুজ্জ্বল হ'য়ে পূর্ণসুন্দররূপে সবলে নিজেকে প্রকাশ করে, সেখানে বড় আনন্দ। সেখানে আমরা আপনাকে বড় ক'রে পাই। মহাপুরুষের জীবনী এই জন্যেই আমরা প'ড়্‌তে চাই। তাঁদের চরিত্রে আমাদের নিজের বাধা-যুক্ত আচ্ছন্ন প্রকৃতিকেই মুক্ত ও প্রসারিত দেখ্‌তে পাই।—তাই ব'ল্‌ছিলাম যে, সকল সদ্‌বৃত্তির অভাবে আজ আমরা আপনাদিগকে পর্য্যন্ত হারাতে ব'সেচি ; সেইজন্যে মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠে—কোন রস উপভোগ ক'রতে পারি না। বহু বেদনার বাণী, "গোরস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠ্‌ বিকায়।" 'অমৃতস্যপুত্রাঃ' আমাদের অমৃতে ঘোর অরুচি, এর চেয়ে অব্যর্থ মৃত্যু লক্ষণ আর কি হ'তে পারে ? "গঙ্গা তেজিন্‌ গঙ্গাকূলে, কূপ খোলন্তি তৃষাতুরে। সুধা তেজিন্‌ বিষখাই, মরিবা সম সে অটই ॥"—অর্থাৎ পিপসায় কাতর হ'য়ে গঙ্গা ত্যাগ ক'রে গঙ্গাকূলে কূপ খনন করে, সুধা ত্যাগ ক'রে বিষ ভক্ষণে মর-মর হ'য়ে পড়ে,—আজ যেন আমাদের সেই অবস্থা। বিষপানের এই মরণ পিপাসা আমাদের কবে শান্ত হবে তা জানেন সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমপুরুষ ; যিনি—

সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, অনাদি, ভাস্কর সম স্বপ্রকাশ,
বিশ্ব বিধাতা, জ্ঞানরূপে যিনি অজ্ঞানো পরি করেন বাস।

শ্রীভগবদ্বাক্য :—

"বিকার বিহীন চিত্তে সতত মম চিন্তনে নিরত হয়—

আমারে পাইলে সকল সাধনা ; পরম সিদ্ধি লভে সে মোক্ষে,
জনম না লয় দুখের আলয় নশ্বর এই ধরার বক্ষে।"

—পাঞ্চজন্য।

পূর্ব্বেই ব'লেছি যে আধিব্যাধি দংশন ভয় নিবারণের অমোঘ উপায় দুর্লভ-ভাবরসমগ্ন ক্ষেপারাই নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন। ঐ ব্যাধিও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে ক্ষেপাচাঁদের অনুগ্রহে যতটুকু জানা গিয়েচে তা এই :—

রোগ কোথায় ?

আপনাকে ভুলাই রোগ।

কিরূপে ?

কোন কিছু দেখ, শুন, বা ভাবনা কর, কোন কিছুর কথা কও, কোন কিছু কর, এক কথায় ভাবনা, বাক্য, কর্ম্ম, যাহা কিছু কর তাহাতেই আত্মবিস্মৃতি আছেই। যদি কোন সঙ্কল্পে মনোযোগ কর, তবে আপনাকে ভুলিয়া সে সঙ্কল্পে মনোযোগ লাগে। আপনাকে ভুল হওয়াই যদি সব হইত তাহাতে সুখ দুঃখের বন্ধন তত হইত না। কিন্তু এই ভুলের সঙ্গে যত কিছুকে অন্যরূপে দেখা হ'য়ে যায়। অন্যরূপে দেখা হ'লেই অন্যের যত কিছু ভাব তাহা নিজের মধ্যে আসিয়া যায়। দৃশ্যদর্শনে হয় আত্মবিস্মৃতি, তাহাতেই আপনাকে অন্যরূপে প্রতীতি ; ইহাতেই যত দুঃখ। তুমি তোমার চিত্তেরই দ্রষ্টা। চিত্তকে দেখিতে দেখিতে আপনাকে ভুলিয়া চিত্ত হইয়া যাওয়াই দারুণ বন্ধন। চিত্তের মধ্যেই সব সঙ্কল্প, সব জ্বালা, সব যাতনা আছে। আপনাকে ভুলিয়া যখন চিত্ত হইয়া যাও তখনি পূর্ণ হন খণ্ড, সৎ হন অসৎ, চিৎ হন জড়, আনন্দ হন দুঃখ।

মধ্যে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইতেছে, মনের মধ্যেও লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের দুঃখ আসিয়া যাইবে। যত আমি আমার বাড়াইবে, ততই দুঃখ বাড়িয়া যাইবে। কেন বাড়িয়া যাইবে জান? তোমার স্বরূপ ছাড়িয়া যতই আমি আমি, আমার আমার, করিবে, প্রকৃত আমিকে যতই আমি বলিবে না, ভুল আমির পশ্চাতে যত ছুটিবে, ততই তোমার দুঃখ বাড়িয়া যাইবে। মরুভূমিতে যেমন মরীচিকা—শত শত মৃগ জলপানের আশায় সেই মরীচিকার পানে ধাবিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, মনের সঙ্কল্প কামনাও ঐ মরীচিকার মত; যতই তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইবে, ততই ভয়ঙ্কর ভ্রম ও বিপদজালে জড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। মনের সঙ্কল্প মাত্র দ্বারা কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়া উঠিতেছে, লয় হইতেছে। মন সঙ্কল্প ভাবনা দ্বারা কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিস্তার করিতেছে আর জনন, মরণ, নিয়মাদি অনন্ত অনর্থ পরম্পরা বিস্তার করিতেছে। তুমি সঙ্কল্প শূন্য হইয়া স্বরূপে স্থিত হও, সঙ্কল্প জয় করিতে পারিবে। মন যদি সঙ্কল্প শূন্য না হয়, মন যদি সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে চেষ্টা না করে, মনকে যদি প্রশমিত করিবার যত্ন না কর, যদি মনঃ-শান্তির সাধনা না কর, তবে গুরূপদেশ, শাস্ত্র ব্যাখ্যা, মন্ত্রাদির সাধনা সমস্তই বৃথা।

বুঝিতেছ চিকিৎসা করিতে হইবে কিসের?

চিকিৎসা করিতে হইবে মনের, চিকিৎসা করিতে হইবে চিত্তের। কেন না চিত্তই সংসারের রূপ, সঙ্কল্পই বিষয় সাগর হইয়া তোমাকে জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, এই ছয় তরঙ্গে নিরন্তর ডুবাইতেছে, উঠাইতেছে। এই চিকিৎসা কিরূপ করিবে তাহাই দেখ:—তখনই তোমার ব্রহ্মপদ লাভ হইবে যখন তুমি সঙ্কল্প কিছুই নয়, সঙ্কল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা, এই ভাবে সঙ্কল্প পরিত্যাগ রূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে চিত্তকে ছেদন করিবে।

এই চিত্তটাই মহাব্যাধি; এই মহাব্যাধির চিকিৎসা করিতে হইলে যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে সেই ঔষধ নিশ্চিত ফলপ্রদ, সুস্বাদু ও সকলেরই আয়ত্তাধীন। সেই ঔষধের কথা বলি শুন:—মন যাহা কিছু ইষ্ট বস্তু বলিয়া তোমার নিকট আনিতেছে (সঙ্কল্পই মনের বড় ইষ্ট) তুমি সেই ইষ্ট সমস্তকে ত্যাগ করিয়া পুরুষকার প্রয়োগে যত্ন কর, চিত্ত বেতালকে জয় করিতে পারিবে। বুঝিতেছ কি করিতে হইবে? সমস্ত সঙ্কল্প যে মিথ্যা তাহা পুনঃ পুনঃ বিচার কর, করিয়া, মিথ্যা সাব্যস্ত কর, সব মিথ্যা সব মিথ্যা বলিয়া সঙ্কল্পকে মন হইতে তাড়াইয়া মনটাকে সঙ্কল্পশূন্য করিতে অভ্যাস কর। তবেই চির বিশ্রান্তি লাভ করিবে, চিত্ত বেতালকে জয় করিতে পারিবে, নিরাময় হইয়া যাইবে অর্থাৎ রাগাদি চিত্তরোগশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে পারিবে। তুমি একটা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও দেখিবে শ্রীভগবান তোমার রথে সারথী হইয়া বসিয়াছেন, পৌরুষরূপে তিনি তোমাকে যুদ্ধে সাহায্য করিতেছেন। যুদ্ধটা কি তাহা জানিয়াছ? আপনি থাকিবার জন্য মনটাকে জয় করাই যুদ্ধ। মনটাকে সঙ্কল্পশূন্য করাই যুদ্ধ। স্বধর্ম্মানুগত হওয়াই প্রবল পুরুষকার। এই যুদ্ধে প্রধান অস্ত্র তোমার দুইটি;—একদিকে বিষয় মিথ্যা, সঙ্কল্প মিথ্যা, ইহার তীব্র বিচার, অন্য দিকে আপন আত্মার স্বরূপ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন, ধ্যান ও অভ্যাস। আত্ম চৈতন্যের সদা অনুভবরূপ যত্ন দ্বারা চিত্ত বালককে রক্ষা কর, বিষয় রোগ চিকিৎসা দ্বারা রোগ মুক্ত কর। অবস্তু হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, জড় বিষয় হইতে ফিরাইয়া, আত্মচৈতন্যে যোজনা কর,—চিত্তকে আত্মস্থ কর। আত্মচৈতন্য কোন্‌টি জান? আমি আছি এই অনুভবটি আত্মচৈতন্যের সৎ অবস্থা। আমার চিত্তের মধ্যে কখন কি হইতেছে, চিত্ত বিষয় লইয়া কখন কি করিতেছে,

বিষয় লাভ করিলেই চিত্ত প্রাপ্তব্য বস্তু পাইয়া একবার শান্ত হয়। চিত্ত শান্ত হইলেই সেই সময়ের জন্য ইহা সঙ্কল্পশূন্য হয়—এই সঙ্কল্পশূন্য অবস্থাই আত্মচৈতন্যের আনন্দ অবস্থা। বুঝিতেছ আত্মচৈতন্যই স্বরূপে সৎ-চিৎ-আনন্দ।

লালন ও ভয় প্রদর্শন করিয়া বালককে যেমন যে সে কাজে নিযুক্ত করা যায়, চিত্তকেও সেইরূপ অল্পে অল্পে আত্মবস্তুতে যোজিত করা যায়, ইহা আর ভার কর্ম্ম কি? বুঝিতেছ কি করিতে হইবে? নিত্য-ক্রিয়াদি করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাক, বসিয়া চিত্ত যখন কোন সঙ্কল্প তুলিবে তখনই সঙ্কল্প মিথ্যা, ইহা বলিয়া চিত্তকে নিজের ঘরে রাখিতে চেষ্টা কর। বিচার করাও এসব কিছুই স্থায়ী নয়, বিচার কর ইহারা বহু দুঃখে বহুবার ফেলিয়াছে—ইহাতেও যদি না শুনিতে চায় তবে চিত্ত প্রথম হইতে যে অপরাধে তোমাকে অপরাধী করিয়াছে পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত ইহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া ইহাকে অনুতপ্ত কর; আর করিব না বলিয়া চিত্ত শ্রীভগবানের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা চাহুক—আর বল, চিত্ত! আর কোন সঙ্কল্প করিও না। গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে, সেই বিন্দুতে, সেই পরমপদে, সর্ব্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া নগ্ন হইয়া লগ্ন হইয়া যাও—এইরূপে লালন ও তাড়নে চিত্তকে সেই সুখময় আনন্দময় আত্মাতে লাগাইয়া ফেল। প্রথমে আত্মারূপ যে ইষ্টদেবতা তাহার চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিয়া প্রণবস্থিত নাদ, নাদ হইতে বিন্দুতে, চিত্ত স্থাপন করিয়া স্থির হইয়া যাও। সাকার ধরিয়া নিরাকারে যাও। মনকে আত্মচৈতন্যে লাগান ভার কি? শুভফলপ্রদ সৎকর্ম্ম ত ইহাই—পুরুষকার ত এই। আমি আছি, আমি জানি—আমিই আপনি আপনি আনন্দ, এই আত্মচৈতন্যে মনকে লাগাইয়া ফেল। ভাবনা বাক্য ও কর্ম্ম, আত্মচৈতন্যের দিকে চাহিয়া,

গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্।

সাধনমার্গের এই ভাবের উপদেশ ক্ষেপাচাঁদের নিকট সর্ব্বদাই শোনা যেত। স্বর্গের বাণী শোনাবার জন্যেই যে তাঁদের আবির্ভাব। প্রবৃত্তির দোষে আমরা আজ এত নীচে এসে দাঁড়িয়েছি যে সে বাণী শোন্‌বার বা বোঝ্‌বার কোন শক্তিই নাই।

বিকারগ্রস্ত জীবনের বিকট চীৎকার ও ব্যর্থ কোলাহলের মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ স্বার্থ চিন্তার ক্লেদকর্দ্দমে ডুবে থেকে আমরা মধুর মাধবের মধুময় বাণী শোন্‌বার শক্তি হারিয়ে ব'সেচি; নইলে তাঁর অভয় অহরহ আমাদের হৃদয়ে বাজ্‌ত। দুর্ঘট ঘটনা স্রোতে ভেসে ভেসে আমাদিগকে অপমৃত্যুর দেশে পৌঁছুতে হ'ত না। তিনি যে পরম-করুণা-কাতর প্রাণে অহরহ এই ব'লে ডাকৃচেন, "মামেকং শরণং ব্রজ।" তিনি যে যুগে যুগে সার্থক করৃচেন তাঁর 'দীনবন্ধু' এই নাম। সাধক তুলসীদাস ব'লেচেন,

"সত্যবচন অধীন্‌তা পর ধন উদাস।
ইস্‌সে না হরি মিলে ত জামিন তুলসীদাস॥"—

অধীন্‌তা অর্থে দীনভাব। ঠিক ঠিক দীনভাব এলে অহঙ্কারের নাশ হয় ও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই দীনভাব কাঙাল ক্ষেপাচাঁদের অন্তরে বাহিরে কি অম্লানভাবে ফুটে উঠেছিল তা দেশ বিদেশের অনেকেরই অবিদিত নাই। ধর্ম্মের পথে, কর্ম্মের পথে থেকে তিনি দেশকে যা দিয়ে গিয়েচেন—সে দান বর্ত্তমান অভিশপ্ত দেশবাসিগণের পক্ষে খুব কমই জোটে। বীরসাধক বামাক্ষেপার মত বীরসাধক কাঙালক্ষেপাকেও বক্ষে ধারণ ক'রে বীরভূম তাঁর নাম গৌরব অক্ষুণ্ণ

যেন দিব্যধামবাসী কাঙাল ক্ষেপাচাঁদের পবিত্র স্মৃতি মনোমাঝে জাগ্রত রেখে তাঁরই মত ব্যথিত প্রাণে কাতরকণ্ঠে ব'ল্‌তে পারি,—

"যে লাগি এলাম হেথা কৈ হ'ল তা রৈল ব্যথা মরমেতে।
বৃথা মুই খেটে ম'লাম ফল কি পেলাম কৈতে নারি সরমেতে ॥"

যেন আমরা জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত মনুষ্যত্বের চর্চ্চায় সার্থক ক'রে তুলে মানুষ হ'তে পারি।

গান

আউলিয়ালি—খেমটা।

শমন তোরে ডর্ব্বো কিসে।

ও তা জান শমনে যা কিছুদিন ছিল ডরা মনে দিশে ॥

হৃদয় ব্রজধাম কাশীতে, হরিহর রাজার মজলিসে,

এবে সংসার-বাসনা দিয়ে ডালি যখন রৈব হবিয়ে।

গান

(১)

আউলিয়ালি—খেমটা।

যে লাগি এলাম হেতা, কৈ হলো তা, রৈল ব্যথা মরমেতে।
বৃথা মুই খেটে মলাম, ফল কি পেলাম, কৈতে নারি সরমেতে॥
আগেতক ছিল গরম গতিকেতে পর্লো ধরা নরমেতে,
সংসর্গেরি দোষে মাথার টুপী যায় গো মারা করমেতে॥
জানি সব হরির খেলা, মন মেলা তায় করি বটে চরমেতে।
মাঝখানে মোচ্‌কে পড়ি, হায় কি করি, কাল কপালের ধরমেতে॥
হলে পর নীচ-ব্যাভারী, ব্যভিচারী যায় না ধরা পরমেতে,
পর্লে পর হাতের মাণিক্ ছায়ের রেশে, ঝারলে এসে, ভরমেতে॥
যা হলো ভালই হলো থাক্‌লে চুপে পর্ব্বি নে বেভরমেতে।
কাঙ্গাল ক্ষেপাচাঁদে কয়, ধরে মারে সয়, বরতা করমেতে॥

(২)

আউলিয়ালি—খেমটা।

শমন তোরে ডর্ব্বো কিসে।
ও তা জান শমনে যা কিছুদিন ছিল ডরা মনে দিশে॥
হৃদয় ব্রজধাম কাশীতে, হরিহর রাজার মজলিসে,
ওরে সংসার-বাসনা দিয়ে জ্বালি [illegible]

মহামন্ত্র পাস করেছি, পাস করেছি বিষয়-বিষে,
এখন বিশ্বমাঝে ঘোরা ফেরা বেখাতির বেওয়ারিসে ॥
সাক্ষী তাহার মন মহাশয়, থারা হরকারা আফিসে,
যদি পড়ে গরজ, বুঝে নেস মোর কাছে তোর ছাড়জারি সে ॥
জেগে আবার স্বপ্ন দেখা, বুঝতে গেলে ব্যাকুবি সে।
কহে কাঙ্গাল ক্ষেপাচাঁদ পেলে সোণা নেয়কি সীসে ॥

(৩)

আসি তবে এ ক্ষেপের মতন।
বল হরিবোল ভরি বদন ॥
ফিরে ক্ষেপান্তরে দেখা হবে অন্ত নহে কদাচন ॥
নেনা দেনা যা কিছু আছে, নাও বুঝে সব দাও বুঝায়ে,
সাজা হয়েছে (আমার), নৈলে পাব সাজা
সময় গেলে যেথানে যাব মনন।
সময়ে সম্ভবে সকলি, ভাঙ্গা হাটে ঢোল বাজালে
গালে চূণ কালী, (পড়ে তার), যেন আগের বুড়ির
সাথে নারে পেছুকার ঘুঁড়ি যেমন ॥
বুঝে দেখ জীবনযাত্রায়, স্বাধীন কভু নয় মানবে
পুরোমাত্রা বায় (কলিতে) ওতা ছলে বলে যাচ্ছি চলে
যা করে জগৎতারণ ॥
চেনা মানুষ লুকায় কোন্ কালে,
যদি যায় কিছুদিন তায় ক্ষতি নাই, পরেও তো মেলে,

অপরাধী পদে হে, ক্ষেপাজ্ঞানে ক্ষমাগুণে থেকে
করোনা ধরোনা কোসে, (হরিহর) সবে সদয় থেকো,
সেধে বলি খুলিয়ে দেলের বেদন ॥
কাঙ্গাল ক্ষেপাচাঁদে বাঁধে তাই, প্রেম গোলামের গোলাম
বটি, বিচ্ছেদে ডরাই (দরদি)
মনে রাই কিশোরীর দশম দশার দুর্দ্দশা করি স্মরণ ॥

(৪)

কৃষ্ণদাসের মহিমা অপার ।
কোয়ে সীমা করে সাধ্য কার ॥
তবে ইষ্ট-কৃপায় যেমন বলী, তেম্‌নি বলি কিছু তার ॥
যে কিছু অসাধ্য জগতে,
বটে সবের সাধ্য সদ্য পেলে দেখতে শুনিতে
(পেলে সেও) ও তার বিপদে সম্পদ ঘটে,
সন্দেহ নাহিক তার ॥
কানে কালা হলেও শুন্তে পায়,
কানা হয়ে চকোল হতে স্পষ্ট দেখে তায়,
যদি রয় বোবা, কয় মৃদু মধুর বাক্য অতি চমৎকার ॥
নির্গুণে অনন্ত গুণবান,
গণ্ডমূর্খ গণ্য জ্ঞানী পণ্ডিতপ্রধান ;
(ক্ষেপা সে) আবার পঙ্গু থেকে অবহেলে লঙ্ঘিয়ে চলে পাহাড় ॥
কাঙাল ক্ষেপাচাঁদে কহে তাই,
কৃষ্ণদাসের দাস বলি হে ছাড়্‌স্থ কুটি ভাই
তবে দুষ্ট মনের খুটিনাটি নষ্ট সে দারুণ ব্যাপার ॥

(৫)

মন সে দশভুজা মানসে কর পূজা,
বিধান সোজা, যা তা বিনয়ে বলি শুন।
বিভব নাহিক ব'লে, ভেবে ব্যাকুল হ'লে,
এতে কি চলে, তুমি কৃতী হলে যখন ॥
কায়া-কাছারি-ঘরে, মালিকানী যে করে,
সারা প্রতিমা তাঁরে নিরূপণ।
জয় দুর্গা হুহুঙ্কারি, বাদ্য উৎসবে ভাণ্ডেতে ধরি,
সুযুক্তি ভক্তি হবে পুরোহিতে বরণ ॥
নৈবেদ্য বাসনা সে, মা সদ্য ভালোবাসে,
সুমতি কুমতি উপকরণ।
ধূপ, ধুনা বাতি তিনে, তাপ তিনেতে মেনে,
জ্বালাতে পোড়াইতে, উৎসাহ হুতাশন ॥
মহিষ মেষ, ছাগ, আদিক বলি-ভাগ,
ছয় রিপু হয় অষ্ট পাশে যোজন।
নিবৃত্তি খুটোয় ধোরে, বিরাগ কর্ম্মকারে,
বিশ্বাস খড়্গধারে করে যেন ছেদন ॥
অশ্বত্থ কাঠের কুচি, আছে শুচি অশুচি,
হোমার্থে জ্বালায়ে তাদের এখন।
ধরম অধরম, করম অকরম,
পুণ্যে বা পাপে হবে আহুতি অরপণ ॥
ইহাতে অবিলম্বে, বরিবে জগদম্বে,

চারি ফল মুক্তি করি, পাবি তা শিরে ধরি,
করিয়ে কোলাকুলি, করিবে বরজন ॥
সাক্ষোয়ানে আখেরি, সসমাহিতে সাবারি পাশদারি,
হইবারি বিবরণ।
কেন্দুলি গাঁয়ে রহে, কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ কহে,
যেখানে দহে শব কুঁড়িয়া নিকেতন ॥

(৬)

ঝাঁপতাল।

হরি হে করি মিনতি, মম দুর্গতি কর বারণ,
সুমতি দানে শ্রীপতি দীনে, নিস্তার দীনতারণ ॥
বিস্তারিয়া বলি সকলি দুস্তর দায় ঘটন,
কামাদি বাদি রিপুদাপেতে সতত মনঃ উচাটন ॥
কভু হাসন কাঁদন কভু ক্রোধি বিরোধিবা মগন
কেমনে পারে এমন ঘরে করিতে তব আরাধন ॥
প্রবল তাপানল তনু নিশি দিশি করে দহন,
বলে জানান মানান নহে যন্ত্রণা সে অসহন,
জান অন্তর্য্যামী যাতনা অন্তরূপী নারায়ণ
অন্তেতে কৃতান্ত তাড়া এ হ'তে সে অসাধারণ ॥
সর্ব্বভূতময় কেশব ভবদর্প-নাশকারী,
শরণাগত-জন-পাবন কৃপানিদান-নামধারী,
পামরে পাপ পাথারে দয়াতরণী দিলে তবে তরি

গড়িয়ে কাঁদে পড়িয়ে ফাঁদে কাঙাল ক্ষেপাচাঁদে এবে,
জীবিতে যেন মরিয়ে আছে স্মরিয়ে তুয়া শ্রীমাধবে।
সাজাকি এতে সাজাবে এত শমনে সমজাতে হবে,
বিচারি বুঝে রক্ষ মুঝে ছাড়ি ছলনা প্রতারণ ॥

(৭)

রে, ভবে এসে ভাবে যে না তারাপদ।
জানিয়ে অভেদ, বিবিধ বিপদ বাদে তারা হরে তারাপদ ॥
যবে জাতি কুল মান, বাদি হবে জ্ঞাতিগণ, রবেনাকো অতুল সম্পদ।
শেষে অন্ন বিনে ছিন্ন ছাড়া, যৌবনেতে জীর্ণ জরা,
জীবন্তে জানাবে মরা, এধারা নহেক রদ ॥
তা বলে যে প্রাণে মেলে, পিবে কে এ ধরাতলে,
তারানামরূপ যে মহানদ।
তাই, স্বনাম কলঙ্ক ভয়ে, অভয় দিবেন অভয়ে,
এড়াইবে তাপদায়ে, হ'তে পাবে পারিষদ ॥
সর্ব্বদেবময়ী শিবে, সদয় যবে হইবে, নিদয় না রহিবে কোন পদ।
কত ইন্দ্রাদি ঐশ্বর্য্য পদ, বিধি বিষ্ণু শিবপদ, সহিষ্ণুতা ভাবে সবে
মাগিবে তাহার পদ।
অন্তে সদা সাধে কালী, বাম্হে বাদি বনমালী, অধঃপাতে যাবার
প্রণালী আদ।
(খেদে) কাঙাল ক্ষেপাচাঁদে বলে, কতবা কহিব খুলে,

(৮)

ত্রিপদী—লঘু একতালা ।

অভিনয়ীনে সবিনয়ে কৈ দেলেজে বেদন খুলে
—ধুয়া ।

আসিয়ে সবায় এ ভব সভায়
সহবতে চলা গিয়েছি ভুলে।
গর সহবতি প্রতি দিবা রাতি নিয়তি
আসনে আসীন মূলে ॥
বিকার বালিশে, লাগায়ে আলিসে
বিয়াল সালিসে সতত তুলে।
খাই ধীরে ধীরে খেয়াল সমীরে
বিরহ বিদিরে খুসি অতুলে ॥
হর ঘড়ি ঘড়ি মায়ামদ মারি
হর হরি করি পরিও চুলে।
সবিপাক কারী, সুহৃৎ নেহারি
রত বিপরীত বৈরিকুলে ॥
বিষসম মেলে বিহিত ধরিলে
অবিহিতে ধরি অমৃত তুল্যে।
করমে তা জানি, মরমেতে মানি
অকরম ধ্বজা দিয়েছি তুলে ॥
যশ কিসে হবে অযশ পরবে
ভেবে কাঙাল ক্ষেপাচাঁদ বাউলে।
ফেলে ঘর বাড়ী বলে হর হরি

(৯)

এ নীতে কেউ নার্ব্বি নিতে।

যাহাতে ওঁচা ওঁচার যোড়া নাই আর অবনীতে ॥

আঁটাভাব অন্তে রেখে, বাহিরে উড়োন পেকে,

স্বভাবে বুজে থাকে কভুবা ঝাকিতে ॥

ও সে কভু হাসে, কভু নাচে, কভু কাঁদে কভু যাচে,

শুচি অশুচি আছে হইয়ে উপবনিতে ॥

ভাল কি মন্দ ছুয়ে, তাকে দ্বারেতে থুয়ে,

পাষাণে বেন্ধে হিয়ে রহে আনন্দেতে ॥

তাতে সুখে দুখে জলাঞ্জলী এদের মাঝামাঝি চলা চলি,

কোরতেক কৃতাঞ্জলি, ধরিয়াছে দোষতা কিতে ॥

ঘরাঘর দাঁত খামুটি, ধরাধন ভিক্ষা মুঠি,

তায় যদি গৃহস্থটী কহিলে ফিরিতে।

ফিরে কথা কবার নাই অধিকার,

বল ব'ল্‌বো কি ছাই এর অধিকার,

হরি বোল সব পরিহার তেনার খেলা সকলিতে ॥

সহজে লক্ষীছাড়া, তায় আবার ভিক্ষা করা

আজব এক ক্ষেপার পারা ধারা বিপরীতে।

ঘোরা বার মাসে তের জেলা, যেন ঘর দরজা গাছের তলা,

নাচের ভিখারী, ঝোলা কান্থা পুঁজি নাই বলিতে ॥

(১০)

হায় কি হলো ভবে এসে, বেকালের বশে ॥

জঠর কঠোর বাসে, যবে জরায়ুপকোষে,
বাদিয়ে সকল আশে, দিগবাসে, পীতবাসে,
ভজিব ভুলেছি কিসে ॥১
ভাবিয়ে দেখি মানসে, লাগিয়াছে মায়া দিশে,
অমৃতে ত্যাগিয়ে লোভী বিষে।
আছে ঋপু পাশ প্রবল বাদী, কালরূপে নিরবধি,
কালেরে হরণ করে কালেতে গ্রাসিয়ে শেষে ॥২
তাই কাঙাল ক্ষেপাচাঁদে বলে, পেতে আসান এ মুস্‌কিলে
অধঃপেতে আদ্‌মী পেলে না দেশে।
তবে মনের বেদন জানেন গুরু, তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু,
ভক্তি শূন্য আশয় গুরু জানেন যদি দয়া বাসে ॥৩

(১১)

বাহারি লঘু একতালা।

মন জয় সীতারাম জগদভিরাম, স্মর অবিরাম তায়।
এতে বিরাম হইবে ভবেরি যাতনা, ভজনা মজনা পায় ॥ ১
বৃথাকাজে কাল করোনা হরণ, কুরস অলস কর বরজন,
হর হৃদি নিধি বিধির ভাবন, সকল ভুবন রায়।
রাম, স্থূলেতে সাকার, মূলে নিরাকার, মহিমা অপার যায় ॥ ২
বিচিত্র বিহিত ইত তনুধামে, হৃদি দলে নব দূর্ব্বাদল বামে,
দামিনী দরপ দলনক ঠামে, সতত সুশোভা পায়।
অমূল অতুল বসন ভূষণ, আদিভূত দোঁহাকায় ॥ ৩

জানকী রাঘব চরণ কমলে, গুরু লাঘবতা জ্ঞানে কুতূহলে,
দিবা নিশানাথ আদি দেবদলে, আছয়ে অলির প্রায়।
দয়া মধুদান সকলে সমান সমজ্ঞান সবাকায় ॥ ৪
মুনি ঋষি জন মানস সায়রে, বিচরে মরালরূপে অকাতরে,
ভকতে করাল কাল সমরে ত্রাণ করেন ত্বরায় ॥
এহেন সুকৃতি শেখর কৃপার আধার নাহি ধরায় ॥ ৫
সময়ে সাধিলে স্ববশে আসিবে, অসময়ে সাধ নিদয় বাসিবে,
কেশবে কি শিবে এ বিধায় সবে, সম্মত সৌম্যতায়।
কাঙাল ক্ষেপাচাঁদে ভণে, পাইবি নিদানে নিরাপদ বেদাওয়ায় ॥ ৬

(১২)

লঘু একতালা।

মন কিশোরা কিশোরী রূপের মাধুরি মানসে কর নেহার।
যাতে হরিষে হরিবি আজন্মকাল, বিরস হইবে ছার ॥ ১
বপুব্রজে প্রেম যমুনারি কূলে, বিহরে বাসনা কদমেরি মূলে,
ঋপু পাশাদিক সখি সখা মিলে,
জগমন সখা ঠার, এঠার সাগরে পাইতে কিনারা
দেবসুরাদি ব্যাপার ॥ ২
নবঘনশ্যাম বামে কমলিনী, নবীনাগলিত কনক বরণী,
বিপরীত রতিরণ গরবিনী পতিপদানত যার।
ধীর মধুর মধুর হাসত ভাবত মধুর ভাব দোঁহার ॥
চাঁচর চিকুর ত্রিলোক চূড়ার, মোহন চূড়ায় শির শোভাকর,
জিনি বিষধর, চারু বেণীপর মুকুট যে জ্যোতিকার।

অলকা আবৃত মুখমণ্ডল, উপমা রহিত কানে কুণ্ডল,
লম্বিত রেখা লোচনে, কাজল, এ নায়ক নায়িকা আর।
কেলি বিচলিত, গলেতে দলিত বনমাল মতিহার॥ ৪
পীতাম্বর স্বমুরারিকর, মুর অরি ভৃগুপদ রেখাধর,
প্যারী পয়োধর আকাশে বিজরি বাসনা বাঁকা প্রিয়ার।
নীলপাট অম্বরী বলয়াদিকরি বিভূষিতা তার আধার॥ ৫
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিন চরণ, নূপুর রণিত ধ্বনি, রণঝন,
উপাসক জন উদাস কারণ নিরুপাসকে বেজার।
তাহে হীরক মাণিক রচিত চরণ রাধাকমলে রাধার॥ ৬
রসিক শেখরা শেষ গুণাকর, শশী কতশত রাজিত নখর,
নাগরী সহিত যুগল মূরত এত রূপার আধার।
কাঙাল ক্ষেপাচাঁদে বলে, পাইবি ভাবিলে, ভববারিধিতে পার॥ ৭

(১৩)

আউলিয়ালি খেমটা।

মন যারে ভাব আপন, সে তোমারে কখন আপন ভাবে বলো।
তবু তার গায়ে প'ড়ে, পায়ে ধ'রে গোলামি করিয়ে চলো॥
জাতি কুল যৌবন ধন মন, সব সমাপন তাতে হ'লো।
তাতেও তোমার প্রতি নিদয় বিনে, সদয় হইতে নারিল॥১
এ রীতে করবে পিরীত, তা না হয়ে বিপরীত কিসে ভাবিল।
ঠেলিয়ে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ক'রে, অলক্ষ্মী কোলে করিল॥২
আবার সরল ব'লে গরল খেলে, সুধাভাণ্ড ভেঙ্গে দিলো।
নিলে না সুহৃদেরি সুমন্ত্রণা যন্ত্রণা হ'লো প্রবল॥৩

জানতো যাচলে জামাই খায়না কাঁটাল, তখন আঁটাল পোণ করিল।
তারপর আস্তাকুড়ের ভুতি খেয়ে দশের মাঝে দর্প গেল ॥৪
যতনের কমি বাকি, নাইক বাকি, আঁয়া ফাঁকি চালাইল,
দূর কর সকল ছাড় হরি হর ব'লে হর সদাকাল ॥৫
রয়েছে শমন পিছে মিছে মায়ায় মোহিত হওয়ায় আর কি ফল।
তাই খেদে কাঙাল ক্ষেপাচাঁদে বলে, কালের গতিক
নয়কো ভাল ॥ ৬

(১৪)

খোদা নাম জাদা দাদা যে কারণে শোন্ বলি তা সযতনে ॥
খোদ্‌কারি ভোর ছুনিয়া, আর ছুনিয়ার যে কিছু সব বর্ত্তমানে ॥
অনুমান সাত ছুনিয়া, স্বর্গ হিন্দুর, ভেস্তাবলে জয় কোরাণে।
রসাতল তল তলাতল, সাত পাতালে দোজখ্ নরক ছুই বাখানে ॥ ১
শরীরে তার সকলি হয় নকলি পয়দা পালন পতনে।
আপ অতস খাকবা বসত, আসমানাতে আছে সমানে ॥২
আলেখ চাঁদ মালিক বটে, তনুঘটে চেতরূপে, সদা রমণে।
মহিমার নাইক সীমা কার গরিমা এক তারিখে নয় কেমনে ॥৩
যাহতে এলি হেতা কল্লি যাতা, কেদ্দানি কার, কর্ম্মে জেনে।
কদম তার ভাবরে মুদম, নিত্য আদম্ কাঙাল ক্ষেপাচাঁদে ভণে ॥৪

(১৫)

একতাল। তানের দেলখেয়ালি।

জয় শিব শঙ্করাশেষ গুণাকর মুনিমনোহর কায়।

শিরজটা ভারে বিহরে জাহ্নবী, বিভূতি ভূষণ হন মহাভাবী,
বিসধর হরণক অভাবি, শশভাল রসরায় ; সুচারু বদন
সহ ত্রিলোচন মদনমোহন যায় ॥১
ধুতুরা কুসুম শোভে শ্রুতি মূলে, ববম্ বোল
ঘন বাজে গালে, ঈষৎ হাস্য অধর যুগলে,
আশুতোষ আধচার, গলে হাড় মাল দোলে দল মল,
দারুণ পাগল প্রায় ॥২
আজানুলম্বিত বরাভয় করে, শিঙ্গা ডম্বুরে শততাল ধরে,
ভূতপ্রেত পিশাচাদি সহ নাচিতে রহে নাচায়।
কভু বাঘাম্বর পরে, দিগম্বর কভু বা হয়ে দাঁড়ায় ॥৩
বৃষভ বাহন বিল্ব মূলাঠান, বিষপানকারী বিপদ পাতন,
পাতক পাবন কৃপার নিধান ত্রাণ তাপ জ্বালায় ;
অজর অমর অযোনিসম্ভব ভববারি ভবদায় ॥৪
ত্রিপুরান্তক ত্রিলোক পূজন, ত্রিলোকোদ্ভব পালন পতন,
ত্রিলোকেশ্বর ত্রিগুণধারণ নিদান-দিনে কৃপায় ;
যেন কৃতান্ত বিবাদে কাঙাল ক্ষেপাচাঁদে অভয় পদাব্জে পায় ॥৫

(১৬)

ও গো দরদি শোন বলি পিরীত প্রণালী প্রাপ্তি ফল
মেলে যাতে সত্বরে।
আছে নানা ভাব নানা রীতি তাহাতে,

হ'লে বিশ্বাসে পূর্ণভর, ব্যভিচার হয় গো পর,
ও যে মহাভাব আপনি ভাবে তাহারে ॥১
আছে অষ্ট পাশ ষড় রিপু বপুতে,
তাহারা যে যাতে মোহিত এ মহীতে,
ও সে বিহিত কর্ম্মচয়, আছে ইষ্ট পদ জলাশয়,
তাতে বিসর্জ্জন দিতে হয় অকাতরে ॥২
ভবে রবে যার আমার কিছু বলিতে,
হবে দত্তাহার অপবাদে বলিতে
এতে প্রেমধনে সত্বাতার বর্ত্তা হইবে ভার,
আবার কানা চোর পায় কি ধন পগার কুঁড়ে ॥৩
ব্রজ গোপীকার অনুমানেতে প্রমাণ,
তারা স্বসুখ স্বত্বত্যাগী সে প্রমাণ, করে মূর্ত্তিমান পুরাণ প্রমাণ,
ধরে গতিকে অনুমান, গতি কৃষ্ণনাম, অন্য গণ্য কি করে ॥৪
নব নেহারি চাতকেতে নীরদে, বলে স্বমুলে নীরদেতে নীরদে,
যেন যায় যায় আর বাঁচেনা, হোক বেজার বিরাগ ধারণা বিনা
পায়না জীবনাধার জীবনাধারে ॥৫
কথা অল্প বৈ অধিক নহে শুনিতে,
তারে লাগে ভার সমঝিলে শুনিতে,
খেদে কাঙ্গাল ক্ষেপাচাঁদে বলে,
আমায় দাও সুধা নাও গরলে,
পোড়া কপালে গুরু কৃপা বেগড়ে ॥ ৬

(১৭)

হে ত্বং জগদীশ দীনেশ গণেশ, কালী বনমালী হর ।

নিত্য নিরুপাধি, আদি অন্তহীন,
অনাদির আদি অভেদ স্বাধীন,
আছয়ে ত্রিলোক তুঁহার অধীন, দীননাথ গুণাকর ॥১॥
অবনী আকাশ পবন জীবন, হও হুতাশন প্রকৃতি প্রধান,
সগুণ নির্গুণ শমন-দমন, সকল ভুবন চর।
সাকার নাকার তাপানল বার, বারণ মরণ জ্বর ॥২॥
সাকারে তোমারে যে করে সাধনা,
সাকারে তাহারে বিতর করুণা,
নিরাকার উপাসকে নিদয়তা হও ত ভাবনাপর।
যে যে ভাবে ভাবে তাতে তার হইবে ভব অর্ণব তর ॥ ৩ ॥
ঋপুগঞ্জন জনরঞ্জন, ভবভঞ্জনাভাব বঞ্চন,
নিরঞ্জন জীবেরি জীবন, জ্যোতির্ম্ময় অধর।
দীন কাঙ্গাল ক্ষেপাচাঁদে এ ভব কয়েদে কর কর অবসর ॥ ৪

(১৮)

আউলিয়ালি—খেমটা।

ক্ষেপা আপন ঘরের খপর রেখে চল।
যাতে কাজের কথার হয় না ছল ॥
ফর ফরিয়ে পরের কথায় বোক্‌লে কিবা হবে বল ॥
আয় বুঝে ব্যয় কোর্কে যে জন,
ও সে পরম সুখে কাল কাটাবে কষ্ট পাবে না। (ক্ষেপা সে)
এরে স্পষ্ট বুলি বোলবো, বঁধ চটবে হবে না অচল ॥ ১ ॥

জীব দিলে যে আহার দিবে সে, স্ববাসে প্রবাসে,
ব'সে নিশি দিবসে, (দেবে সে)
ও তার ভাবের ভাবী হলে বটে নৈলে সকলি বিফল ॥ ২ ॥
ছুঁচো উড়ে অন্দরে যাহার, করে বাহিরে কোঁচা তুলিয়ে জারি
সবাই বলে ছার, (গো তারে)
এটা কাঙ্গাল ক্ষেপার কথা ছেড়ে দে চাতুরী ছল ॥ ৩ ॥

(১৯)

ভবের মাঝে সেই সকলি।
ও সে দশ মহাবিদ্যা কি বা, দশ অবতার বনমালী ॥
একেতে অনন্ত হয়ে পূরিয়ে ব্রহ্মাণ্ডলি।
করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বটে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি ॥ ১ ॥
দেব দানব আদিক মানব দুর্ব্বল বা মহাবলী।
যত পশু পক্ষী পতঙ্গাদি ক্রিমি কীট করিয়া বলি ॥ ২ ॥
রাজা প্রজা শিষ্য গুরু দোষ্য গুণী পণ্ডিতালী,
জ্ঞান মুখ্য মূর্খ সাধু চোর আর গাঁজাগুলি, মদমাতালী ॥ ৩ ॥
বেশ্যা বেওয়া ঘুসকি পতিসাধ্যা সতী ছাড় ছেনালী,
মান হুজুর মজুর মাতবরিয়া মেগে খায় অপরে কাঙালী ॥ ৪ ॥
ম্লেচ্ছজাতি হালের রাজা ইংরাজ ও মিঞা বাঙালী,
সাধে বৈরীরূপে বাদে বন্ধুরূপেতে বন্ধুত্বালি ॥ ৫ ॥
তৃণ লতা তরু মেরু সাগর পাহাড় পঙ্কপলি।
কত নানা জাতি মুক্ত মতি ধাতু শাঁখ গুগুলি বালি ॥ ৬ ॥
আপনি রচে আপনি নাচে আপনি দেয় করতালি,

রোগী রোজা ঋপুর গোলাম ঋপুজয়ী দর্পশালী।
হেতো জন্ম মরণ স্থায়িত্বতা উদ্দাতলীলার প্রণালী॥
দেখে শুনে বুঝে মনে বুঝে হুসারে যা চলি।
বরং বাদিয়ে বিবাদে বল হরিষে হরিহর বুলি॥ ৭॥

(২০)

আউলী—খেমটা।

ভাইরে ভাই দেলের কথা খুলবো কায় (কথা কায়)
তবে বলবো মনের মানুষ পেলে, নৈলে চিতানলে দহিলে কায়॥
ব্যথার ব্যথী কে আছে মোর প্রবোধ বারি দেয় কৃপায়,
ও তায় পাইলে খুঁজে গতিকেযে,
চোরের মায়ের কাঁদার ন্যায়॥ ১
ভবের পাশা খেল্‌তে হলাম ভুক্ত গোলামেরি প্রায়।
ওতো ফুকারিতে নারি লাজে পারি না যে তাও নয়॥ ২॥
কি করিব ভাবছি ব'সে কোচ্ছি নালিশ বা কোথায়।
আমি যার কাছে যাই শালিসে ব'লে,
সেই তাড়া দেয় সাত তাড়ায়॥ ৩॥
(পোড়া কপাল গুণে) ঘরের যাঁড়ে পেট পারে কি
ঘর ঘোরে রোগ ঘটালে তায়।
তাতে নড়বড়ে হয়েছি এঘোর দরবারে কে দাঁড় করায়॥ ৪॥
ঘুসকির পিরীত ঘুসঘুসে জ্বর অস্তে খুলে পায়,

বেদরদি দলে আমায় মনবিবাদী বাধা পায়,
আবার দরদি হ'লে হৃদ্‌কমলে সেই দিবাকর পদে রয়॥ ৬
এ মুস্‌কিলে আসান মেলা কাঙ্গাল ক্ষেপাচাঁদের দায়,
এবে অন্য বিধান গণ্য বৃথা যদি গুরু সদয় হয়।
নইলে নয় ও তা নৈলে নয়॥ ৭

(২)

আউলিয়ালি—খেমটা।

হরি তোমার মায়া বুঝা ভার।
ভবে আছে অনন্ত অপার॥
এতে ভ্রান্ত না বোনেছে, এমন ত্রিভুবনে মেলা ভার॥
দেবে দানবে মানবেতে,
মহামানব পাদ্‌রী যোগী প্যায়গম্বরেতে, (হে হরে)
ভব দারুণ মায়ার দরবারেতে দর্প গেছে সবাকার॥ ১
অন্ত পেতে অনন্ত ব্যাপার, আছে দেব পুরাণে প্রমাণ
মায়ায় মুগ্ধ চরাচর, (হে মায়ায়)
বটে চর্ম্ম চক্ষের গোচর সে মর্ম্ম বাকের অগোচর॥ ২
ব্রহ্মা বাবা ব্রজভাবেতে বিকার ভেবে বেড়িয়ে গেল,
মায়ার পুরেতে (হে ভব) জীবনান্ত হ'তে হলো,
বাকি কিবা রৈল আর॥ ৩
মুনির শিরোমণি যে নারদ, ও সে সর্ব্বলোকে করতো
গমন পড়তোনাকো রদ, (হে হরে)

অন্ধ জীবে জানবে কেমনে,
তবে কর্ম্মবশে ক'রছে ভ্রমণ ভবকাননে। (হে হরে)
আগে প্রমাণোতে ঘোল খেলে পর, জঘন্যে গতিকে ছাড় ॥ ৫
কাঙাল ক্ষেপাচাঁদের এই বলা,
যেন চরমকালে নরম ব'লে করোনা হেলা, (হে হরে)
দিও ভবার্ণবের ভেলা অভয়পদ বিপদ নিবার ॥ ৬

(২২)

আউলিয়ালি—খেমটা।

হরে কৃষ্ণ বল্‌রে বদনে, সিঙে ফুকে যাবি কোন্ দিনে।
তখন ভাই বেরাদার ছেঁড়া চাটায় বেন্ধে দিবে শ্মশানে ॥
দারা সুত থাক্‌বে যে জনা,
দিবে নুড়া জেলে যে মুখেতে খাওরে ক্ষীর ছানা, (ক্ষেপা মন)
তখন প্রাণ প্রেয়সীর সঙ্গে হাসি খুসি রবে কোন্‌খানে ॥ ১
কোথা রবেরে টাকা কড়ি, কোথা রবে ঘর দরজা,
ঘোর ভুয়া জারি, (ক্ষেপা তোর)
ওরে আশার গুড়ে পড়্‌বে বালি, তাও জেনে জান্‌লি নে।
মন রসনা এখন আছে কাল, পাস রিপুবশেতে
চরম কাজের কথায় চল, (করিসনে)
পেয়ে হাতের পাঁচ হার্‌বি বাজী কেহ সিয়ার হবিনে ॥ ৩
অসার সম্পদের ভাবনা,
অশেষরূপে অর্থ পেলে অন্ত পাবিনে। (ভাবনায়)

কলির তারক ব্রহ্ম হরিনাম, শয়ন-স্বপন-ধ্যানে-জ্ঞানে
বলরে অবিরাম। (হরিনাম)
ও তোর তাপন নিভায়ে যাবে এই হরিনাম জীবনে ॥ ৫
বিরস তরণী পরে মন, গেয়ে নামের সারি হ কাণ্ডারী
করলে আরোহণ। (ক্ষেপা মন)
ওরে কাঙাল ক্ষেপাচাঁদের বচন তর্‌বি ভব তুফানে ॥ ৬

(২৩)

বাদী মন যেতে চায় ভাবনগরে ফেরের কথা জানেনা।
অনুরাগের করণ নৈলে গমন করবে কোন্ জনা ॥
কাহিনী বিহীন নরে, ফণীরে ধরিলে পরে,
দংশে তারে বিষে জ্বারে রাখ্‌তে নারে বাঁচে না ॥১
যাবার পথে পদে পদে, পড়্‌তে হবে ঘোর বিপদে,
নির্ব্বিবাদে নিরাপদে, পৌছিতে প্রায় কেউ পারে না ॥২
পাশ পাহাড়ে ভ্রম-কাননে, করে ভ্রমণ রিপুব্যাঘ্রগণে,
গেলে থমক হীনে, দমক খাবার মার্‌বে খাবে ছাড়্‌বে না ॥৩
সে যে তাপসাগরের অপর পাহাড়,
বিধি বিষ্ণু বিষধরের অপার, চন্দ্র সূর্য্য পবনের অগোচর,
গোঁড়া তাও গণেনা ॥৪
নিরানন্দ নাইকো তথায়, জরা মরণ যায় পরাজয়,
ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য পাপের বাপের জারী চলে না।
আপ্নি ইন্দুরভেরো হ'য়ে, খুদের পুঁড়ো পোঁদ লয়ে,
সাঁতারে পার হবে সাগর মর্‌বে ডুবে ভাবে না।
কাঙাল ক্ষেপাচাঁদের বলা, ঢেঁকি সাতসেতে যায় না গেলা,

(২৪)

আউলিয়ালী—খেমটা।

ভাবনগরে যাবি যদি শোন বাদী মন মন্ত্রণা।
হ'লে মহাভাবের ভাবী, যেতে পার্‌বি যাবে যন্ত্রণা॥
যে জানে কহিয়া বাণী, সেজনে ধরিলে ফণী,
দংশিলে তার হয়না হানি, বাঁচতে পারে মরণে॥১
যাবার পথে বিঘ্ন যত, বিধানে হইবে হত,
হ'য়ে লতার মত নত, গোপীভাবের অনুগমনা।২
দাগিয়ে বিরাগ কামানে, ও পার পাশ পাহাড়ে ভ্রম-কাননে,
গুরুদত্ত যে ক্রম থমকদানে,
দমকা রিপু রাথ বাগানা॥৩
যেতে তাপ সাগরে আর পাহাড়ে,
চড়ে প্রেম তরণীর উপরে, গুরুভক্তি নিশান হাতে করে,
গেলে বাদী কেউ হবে না॥৪
প্রবেশিলে সে মণ্ডলে, পরিত্রাণ ভব গণ্ডগোলে,
রবি নিত্যানন্দ তুলে, রবিসুতে তাল পাবে না॥৫
সেথা অসাধ্য সুসাধ্য হবে, সাহসে ঢেঁকি গিলিবে,
মূলে মেকি টাকার মূল্য আধা, তার বাধা আর হবে না॥৬
তবে গুরুর কৃপা হবে যারে, সেই সে যাবে অন্তে নারে।
হবে অনুরাগী কর্‌বে করণ, কাঙাল ক্ষেপাচাঁদের ভণা॥৭

(২৫)

তওট তাল।

ও গো দরদী শোন্ গো শোন্, এই মম নিবেদন,

ভবসাগর সলিলেরি মাঝারে, তাতে তনু তরী যৌবন জোয়ারে,
আবার ভক্তিহাল ভেঙ্গে গেছে, মায়াপাল প'ড়ে আছে,
ঋপু ছয় দাঁড়ি বায় যে বায় অকূলে ॥১
আছে অষ্ট পাশ নষ্ট সেরা গুণরি, তারা সময় গুণেতে বিগুণ ধারী,
এতে কেমনে পাইবা কূল, তাই ভেবে প্রাণাকুল,
সবে প্রতিকূল, মূল উম্মূল হয় মুসকিলে ॥২
আমার নিবৃত্তি নঙ্গড় নাইকো কাছে,
তাতে প্রবৃত্তি কাছি কেটে গিয়েছে,
হ'লো কর্ম্ম বশ পেকোবাতাস, পাক প'ড়ে হলাম হতাশ,
এতে পাশ কথায় ছ'লতে হ'লে কৈ চলে ॥৩
ওগো অভিমান ঘুরানে পড়ে যখন,
হাবুডুবু খায় গুমান গুরু হয় তখন,
গতিকে কাবু হ'য়ে আশাতোড়ে ভাসিয়ে যায়,
চলে না যায় ভয় না যাই ভুলে ॥৪
ক্ষেপা মন মাঝি নারাজি হয়েছে তায়
আশী লক্ষ ক্ষেপকাল বা আজি বলে নয়,
চলে চারি যুগে এমনি প্রকার ফলে ধাক্কা সার চিন্তা চড়ায়,
বাঁচে মক্কা কি মথুরায় কিনার পেলে ॥৫
বিরাগ চড়নদার সহায় যদি থাকিতো,
তবে বিবাদী বাদেতে কি বাধিত,
গুরু ভক্তি ইঞ্জিন বসাতো, মহামন্ত্র দম দিতো,
হ'তো ভ্রান্তিদূর শান্তিপুর যেতো চ'লে ॥৬
আছে ললাটে লেখা যা তা ফলে যায়,

আমি তাই মনে করে আশ, তোদের বল্‌ছি দাস,
কিসে নাশবে ত্রাস কাঙাল ক্ষেপাচাঁদে বলে ॥৭

(২৬)

আউলিয়ালি—খেমটা

মন মানুষের কি মজার লীলে ॥
কতো ব'ল্‌বে রে কে তা খুলে ॥
ও তা বে-কেতা সমাজের মাঝে, কৈলে বলে বব্বোলে ॥
স্বরূপে স্বরূপ মিশায়ে আশী লক্ষ জীব চেতন ভাবে আছে
চুপ হ'য়ে, (ক্ষেপা সে)
ও তার কুত্ত ভূতের কেরদানীতে জগৎ জাহির করিলে ॥১
ঝলক মারে চোকের উপরে, ত্রিলোকে পলকে তারে তাক্‌তে
কে পারে (ক্ষেপা তার)
মনে থাক্‌তে বিকার, তাক্‌তে ব্যাপার পেয়গম্বর কি
দেবদলে ॥২
সাগরে পাহাড়ে জঙ্গলে, সহরে নগরে গাঁয়ে নিগমে গেলে,
(লীলেতার) ওরে হক বেহকে সেই কুহকে,
না পড়ে কে কোন কালে ॥৩
হর তনুঘটে ঘোর ঘটনা, তাতে চটায় পটায় হাসায়
কাঁদায় কেনা তার কেনা, (দরদি)
আছে জানা শোনা তা ব'লে কেউ ত্রাণ পেলে না ভূতলে ॥৪
দেল্‌কেতাবে দেখবে যে জনা, ও সে মর্ম্ম বুঝি যাবে
বুঝে বেজার করে না, (ক্ষেপারে)

কাঙাল ক্ষেপাচাঁদে এই ভাবে, আছে যা কিছু সব
দুনিয়াজেলে সবের মালিক সে, (ক্ষেপারে)
ও যা হয়েছে যা হতেছে হবে; দেখ ভেবে সে সকলে ॥৬

(২৭)

অনুরাগে মন মজেছে যার।
সহজে স্বরাগের মানুষ নির্ব্বিকার,
তার জন সমাজে লাজের কথা হয়েছে রে অলঙ্কার ॥
জ্যান্তে মরা হয় অনুরাগী, ওরে জেতের বিচার আচমন
আচার বেদবিধি ত্যাগী, (ক্ষেপা সে)
ভবপথের সম্বল ছেঁড়া কম্বল, আর ল'য়েছে হাতে ভাঁড় ॥১
বসন ভূষণ ধন মান অপমান,
সেই মহানের কাছে আছে হয়ে অপমান, (দরদি)
বটে হিংসা নিন্দা ছাড়া বান্দা, শুভা শুভে ভাবে ছাড ॥২
লাভে হেসে হয় না আট খানা, অলাভে বিষাদে বোসে
বোসে ভাবে না, (ক্ষেপা সে)
সাদরে কি অনাদরে সমভাবে নয় বেজার ॥৩
ভজন বাদী কামাদি ছজন,
প্রেম বিরাগী অনুরাগী করে না গণন, (বাদী মন)
সে যে অষ্ট পাশে নাশ ক'রেছে কেটেছে মনের আঁধার ॥৪
গুরু বাক্য আত্মা সম তার, (তার)
নিরুপাধি ভবনদী হেলায় হবে পার, (ক্ষেপা মন)

কাঙাল ক্ষেপাচাঁদের এই বাণী, এম্‌নিধারা হলে ধারা,
রাগী তায় গোণি, (রে)
তা নৈলে লোক দেখানে বেশ ভূষণে,
ফায়দা কিছু নাইকো আর ॥৬

(২৮)

দেখ দেখ দরদী ভেবে তাই।
আপনি মোটা কার্‌বা এটা ভবের মাঝে ভাবা নাই ॥
আয় বাড়াবো, আমীর হবো, এই বাসনা হয় সদাই ॥
ও সে দেশ বিদেশে, নাম পাবার বিরাম নাই আর
আশাবাই ॥১
ধনী মানী গুণী জ্ঞানী মন মগণে মেনে যাই।
তাতে খেদের কারণ মুদ্‌লে নয়ন ধর্‌তে ছুঁতে কৈ কি পাই ॥ ২
পিতা মাতা পত্নী ভ্রাতা, সুত সুতা বোনাই ব্যাই।
আছে অনুগত স্বগণ যত, কার বলে আমার বোলাই ॥ ৩
কর্ম্মবশে ভবে এসে রঙ্গরসে কালকাটাই,
আছে সুপ্রসঙ্গে ব্যাঙ্গা ব্যাঙ্গি কুপ্রসঙ্গে বেশী তাই ॥ ৪
অধর চাঁদের কৃত ভূতের কেরদানীতে কে এড়াই।
যদি গোল ছেড়ে যাই জঙ্গলে তায় ধরে করে নড়াই ॥ ৫
সে সময়ে জয় করে যে, সিপায়ের বেটা সিপাই সেজে,
শান্তিপুরে জয় করে সে কালের মুখে দিয়ে ছাই ॥ ৬
কাঙাল ক্ষেপাচাঁদে বলে মুস্‌কিলে পড়েছি ভাই

(২৯)

আউলিআলি—খেমটা

প্রশ্ন

এখন মনের মানুষ কোথায় পাই বলগো তাই সুধাই।
ওগো অন্য কথা ফেলগে দূরে মান্য করে ফায়দা নাই॥
কনক কামিনী মানে বয়স ভূষণে, মেলে যেখানে
সেখানে মরি হায়॥
তাতে তাতিলে মাতিলে দাদা মুদমে মন কলা খাই॥ ১
তার অভাবে হাল্‌ছে বেহাল নাকালের চরম,
গেছে কুল লাজ ভরম, "মরি হায়"
এবে গৃহবাসে উদাসী হ'য়ে বেড়াই॥ ২
ছেঁড়া কেঁথা গলে দিয়ে করি ছেনালি, ক'য়ে হরিহর বুলি,
"মরি হায়"
ল'য়ে কাঁধে ঝুলি ভিক্ষে মেগে দেহ রক্ষা করে যাই॥ ৩
তৃসিত চাতকী যেমন আকাশে ওড়ে,
ফটিক জল ফুকার ছাড়ে (মরি হায়)
থাকে হাহাকারে তেমতি মতি যে কহিয়ে জানাই॥ ৪
আশাবায়ু প্রবল হ'লো শান্তির উপায় কৈ,
সাধুবৈদ্য পেলে কৈ (মরি হায়)
ও স্বদেশে বিদেশে ছদ্মবেশে, ঘুরে হদ্দ হনু ভাই॥ ৫
পাকা বেলে কাগা কভু ঠুক্‌রে পায় না শাঁস।
পরে ঠোঁট ভেঙ্গে নৈরাশ, (মরি হায়)

(৩০)

আউলিআলি—খেমটা

উত্তর

ক্ষেপা মনের মানুষ মিলবে যায়, শোন্ সাদা উপায়।
স্বদেহে সে বিরাজিত বাহিরে খোঁজা বিফল হয় ॥
কনক কামিনী মানে বসন ভূষণে,
ও সে ভোলে না মানে (মরি হায়)
তাতে ভোলে আবার তাও বলি, সাঁচ বলি এতদুভয় ॥ ১
নিত্যধনে বাধ্য বটে নিত্য গুণাকর ; প্রেম প্রয়াসী নফর,
বিরাগবাসে মনবাসে তার বিশ্বাসে মান বাড়তে রয় ॥ ২
ভক্তি ভূষণ ভালবাসে ত্রিভুবনভূষণ,
ও মুই কইনু সব কারণ, (মরি হায়)
হৃদিমন্দিরে বন্দিয়ে নাগর সাধি দিন সমুদায় ॥ ৩
যোগে যোগে জোগাড় ক'রে যত্নে তারে দে,
সদয় হবে অবাধে তার সাধে সাধে,
আর বিধানের বিবাদে কাল বৃথা যায় ॥ ৪
আশাবায়ুর শান্তি হবে যাবে হাহাকার,
পাবি আনন্দ অপার,
এবে এড়াইবি মনে মনে মনকলা খাইবার দায় ॥ ৫
বেহালবেশে দেশ বিদেশে ঘর বা বার হ,
ও প্রবাস বা বাসের তরে কাজের কথায় চল, করিলে বলিবো তায় ॥৬
পাকা বেলের কাগের মতন আশাগুড়েতে বালি পড়ে না
এতে (মরি হায়), এযে মনস্কাম, মসকরা কথা

(৩১)

গুরুপদে আছে রে যার মন।
তার দেহ নিত্য বৃন্দাবন।
সে ত্য'জে ভবন, তীর্থ ভ্রমণ কর্‌বে বা কিসের কারণ ॥ ১
হৃদয় মাঝে মক্‌কা মথুরা,
পীর পীতবাস তায় করে বাস পৃথক নয় তারা (দরদি)
সে মর্ম্ম জেনে মন গুমানে মানস-ধ্যানে অচেতন ॥ ২
বিধি বিষ্ণু বিষধরেতে,
করে গুরু সেবা জিন্দাবাবা, এই অবনীতে (রে তারা)
করে ত্রিগুণ ত্রিগুণাকরে পয়দা পালন পতন ॥ ৩
গুরুর কৃপা পায় যে জনা,
সে শীত উষ্ণ সুখ কষ্ট স্বপ্নে জানে না (ক্ষেপা সে)
অসাধ্য সুসাধ্য রে তার প্রেমে বাধ্য ত্রিভুবন ॥ ৪
ঘোর বিপদে নিরাপদে রয়,
তনু-ঘরের ঢেঁকি হয় না কুমীর ঘোর থাকে না তায়।
ও সে দেল সহরের আমীর বটে নাম বটে তার মহাজন ॥ ৫
জানা যায় তা আভাসে,
স্বভাবের ভাব রয় না ছাপা আপ্‌নি প্রকাশে।
যেমন মাণিক চাপা থাক্‌লে পাঁশে,
তায় নাশে কি তার সে কিরণ ॥৬
মুক্ত হ'তে ভববন্ধনে, সেই গুরু দত্ত মহামন্ত্র শক্ত খাঁড়া নে।
ও ধর তায় মন রচনে

(৩২)

সঘনে সদা কালি-বদনে বলো কালী।
কাটিতে মনের কালি পাকা প্রণালী শোন॥
অনাদির আদি কালে, কালিকা কারণজলে,
শব ছলেতে ভাসিলে যখন॥
ব্রহ্মাদি দেব তিনে, ভজি ভজি পেলে ত্রিগুণে,
হইল সৃষ্টি স্থিতি পতনেরি কারণ॥
সাধে যে শ্যামাপদ, শ্যামে জানে আপদ,
আপদ পদে পদে বিপদ বিধি বিড়ম্বন॥
কয় কেঁচকে বাসীরামে, রয় যেন শ্যামা শ্যামে,
উভেতে অন্তিমে অবিরামেতে মন।
জগতের জাত যত, মো সবার মতে তাত,
মা'র মায়াতে মোহিত ত্রিভুবন॥

(৩৩)

সংকীর্তন।

ওরে হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, বোল হরিবোল,
হরি বল হরিষে।১
ও ভবনদী পার করিবে হয়ে দাঁড়ি ভাই হরিষে,
নৈলে হরি কি তোর বাগান মালী ডাকলে হাজির হবে এসে॥২
ও বল কায়মনে, শয়ন-স্বপন-ধ্যানে-জ্ঞানে,
বাদ্ দিয়ে অলস কুরসে॥৩
ওরে কাল পেয়ে কাল কাটাস নাকো।

ও তোর আশাক্ষুধা ক্ষান্ত হবে, নামামৃত সুধারসে,
ও তোর নিভ'ইবে তাপানল,
এই হরি নাম জল পরশে ॥৫
এ নাম রসনা বীণাতে বাজা বাসনা করেতে কোসে,
ওরে কলির তারক ব্রহ্ম নাম ব্যাস পুরাণে প্রকাশে ॥৬

(৩৪)

কেন আপন ভুলে মর ঘুরে।
চল ল'য়ে পরম পদে দীপ কলিকাকার জীবাত্মারে ॥
কুণ্ডলিনী মূলাধারে, তাহারে সঙ্গে ক'রে,
সুষুম্নার পথ ধ'রে চলরে ভ্রান্ত ধীরে ধীরে ॥
মূলাধার সাধিষ্ঠান, মণিপুর পরে মন,
অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞা ছয়টী চক্র ভেদ করে ॥
শিরে শোভে সহস্রদল, অধোমুখে এক কমল,
তাহার কর্ণিকাতল পরমাত্মা বিরাজেরে ॥
পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, গন্ধ আদি গুণ যত,
দশেন্দ্রিয় প্রকৃতি আর মনোবুদ্ধি অহঙ্কারে ॥
চব্বিশ তত্ত্বে লয় করি, 'যম' বায়ু বীজ স্মরি,
দক্ষিণ নাসাপুটে ধরি পূরক করি ধীরে ধীরে ॥
বাম কুক্ষি আশ্রয় ক'রে, যে পাপ পুরুষ বিহরে,
কুম্ভককালে শোষি তারে কর রেচক দক্ষিণ দ্বারে ॥
রক্তবর্ণ 'রম্' বীজ ধ্যানে, ষোড়শরূপে করি পূরণে,

ভস্মসহ রেচক করি, 'ঠম্' চন্দ্র বীজ ধরি,
করি পূরক ধীরি ধীরি চন্দ্রে উঠাও ললাটোপরে ॥
কুম্ভকে 'বম্' বীজ ধর, দেহ চন্দ্র সুধায় পূর্ণ কর,
র "লম্" বীজ বত্রিশবার জপি দৃঢ় কর কলেবরে ॥
"সোহহম্" ইহা স্থির করি, পুনঃ পূর্ব্ব পথ ধরি,
আনি জীবাত্মাকে হৃদয়োপরি সাজাও সবে পরে পরে ॥
এরূপে ভূতশুদ্ধি ক'রে, আপনি পূজ আপনারে,
স্বরূপে কান্তি মিশাবে পরে, শোক তাপ যাবে দূরে ॥

(৩৫)

ও বান্দা দেল মাঝে দরিয়া ॥
দেল মাঝে দরিয়া বান্দা দরিয়া মাঝে দেল ;
কোন্খানেতে বিরাজ করে, হেরে হেরে সন্ধান দেলের মহাজন ॥
জননীর গর্ভে কন্যার ছয় মাস গর্ভ রহি,
কে ছিল তার মাতা পিতা (তথা সেই নিগমে) কে ছিল তার পতি ॥
কোন্খানেতে পেলে বান্দা বিনা দুধের দই, কোন্খানেতে
পেলে বান্দা বিনা ধানের খই ॥
আপ্কা জাহের ক'রে আপ্নে হাতমে নিলেক ভার,
স্ত্রীর পেটে স্বামীর জন্ম দুগ্ধ খেলে কার ॥
এক আঙ্গুল ফকির রে তার আড়াই আঙ্গুল মাথা,
এ হেন বান্দা পিয়েনে পানি পেলে কোথা ॥
দুনিয়া জুড়ে ফকিররে তার দুনিয়া জুড়ে কাঁথা,
এ হেন বান্দা গয়রত হলে কব্বর হবে কোথা ॥
মাঠের মধ্যে বটের বৃক্ষ সেইত মাঠের মাথা,

(৩৬)

আসিয়ে কিন্‌তে সোনা, কিন্‌লি কিনা
ওরে কানা রাংতামাকে।
ভবের মাঝে এসে লাগ্‌ল দিশে
ঘুচবে কিসে বল্‌ আমাকে।
রাং রজ তামা তম সোণার স্বত্ত্ব গুণ যাহাতে,
দরদী হবে যে জন, কিন্‌বে সেজন,
অন্তে কিবা চিন্‌বে তাকে।
না হ'লে ভাবের ভাবী ভবের হাটে গোল মেটে কি ভূয়ো জাঁকে,
ক্ষেপাচাঁদ বলে ফাঁকা লাভের তরে ভাবের ঘরে পড়্‌লি ফাঁকে।

IMPERIAL LIBRARY